বৌদ্ধধর্ম্ম

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পূ র্ব্বা শা লি মি টে ড
পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনু্য, কলিকাতা

আষাঢ় ১৩৫৫

প্রথম সংস্করণ

দাম তিন টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড পি, ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন ত্ত কর্ত্তৃক দ্রিত ও প্রকাশিত।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে ?

বৌদ্ধধর্ম্ম যত লোকে মানে, এত লোকে আর কোন ধর্ম্ম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবিরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়রের সব লোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্দ্ধেকেরও বেশী বৌদ্ধ। বর্ম্মা, সায়াম ও আনাম অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ। সিংহলদ্বীপে অধিকাংশ বৌদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম্ম না মানিলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও অনেক জায়গায় বৌদ্ধ মত একটু বিকৃতভাবে চলিতেছে। চাটগাঁ, রাঙ্গামাটীর ত কথাই নাই। উহারা বর্ম্মা আরাকানের শিষ্য। উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্যে এখনও বৌদ্ধ মত চলে। তাহার মধ্যে বোধ নামক রাজ্য যে বৌদ্ধমতাবলম্বী তাহা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। বৌদ্ধেরা এই সকল মহলে অনেক দিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা মহিমপন্থ নামে এক নূতন বৌদ্ধ মত চালাইয়াছেন। বাঙ্গালায় যাহারা ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা করে তাহারা যে বৌদ্ধ একথা এখন কেহ অস্বীকার করেন না। বিঠোবা ও বিল নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পূজা হয়, কিন্তু এই দুই দেবতার ভক্তেরা আপনাদিগকে বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে যে তন্ত্রশাস্ত্র চলিতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের গন্ধ ভরভর করে। যাঁহারা বলেন ওম মহাশূন্যে তারা ... মহাশূন্যে কালিকা, তাঁহারা বৌদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহেন, কারণ কোন হিন্দু কখনও শূন্যবাদী হন নাই, হইবেন না ও ছিলেন না।

এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব আরও বিস্তার হইয়াছিল। তুর্কীস্তান এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের আকর ছিল। সেখান হইতে সাময়েদরা এবং তুর্কীস্তানের পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম ... ইয়াছিল। পারস্য এককালে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রভৃতি সব জায়গার লোকেরাই বৌদ্ধ ছিল।

পারস্যের পশ্চিমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। কারণ রোমান কাথলিকদিগের অনেক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পদ্ধতি বৌদ্ধদেরই মত। রোমান কাথলিকদের মধ্যে দুই জন 'সেণ্ট' বা মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম 'বারলাম' ও 'জোসেফট'। অনেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে এই দুইটি শব্দ বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শব্দের রূপান্তরমাত্র।

অনেকে এই বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস দিতে সক্ষম হন নাই। কারণ বৌদ্ধেরা বড় আপনাদের ইতিহাস লিখেন নাই। মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের নামও শুনেন নাই। তবকতিনাশিরী ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস হইবার ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলেন, মহম্মদি বক্তিয়ার ঐ বিহারটাকে কেল্লা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যখন উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত "দুর্গরক্ষী সৈন্য" বধ করিয়া ফেলিলেন, তখন দেখিলেন, সৈন্যদিগের চেহারা আর এক রকম; তাহাদের সব মাথা মুড়ান ও পরনে গেরুয়া কাপড়। তখন তিনি মনে করিলেন, ইহারা "সব মাথা মুড়ান ব্রাহ্মণ"। আবুল ফাজল এত বড় "আইনি আকবরী" লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধেরাও বড় করে নাই; করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা কিরূপ হইতেছে? শুনা যায় এককালে কোন অন্ধনিবাসের লোকে হাতী দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সকলেই অন্ধ, সুতরাং তাহাদের জীবন্ত হাতী দেখান কঠিন। সেইজন্য অধ্যক্ষ অন্ধগুলিকে একটি মরা হাতীর কাছে লইয়া গেলেন। কানারা হাত বুলাইয়া হাতী দেখিতে লাগিল। কেহ শুঁড়ে হাত বুলাইল, কেহ কাণে হাত বুলাইল, কেহ দাঁতে হাত বুলাইল, কেহ মাথায় হাত বুলাইল, কেহ পিঠে হাত বুলাইল, কেহ পায়ে হাত বুলাইল, কেহ লেজে হাত বুলাইল। সকলেরই হাতী দেখা শেষ হইল। শেষে

সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেখানে সকলে ঝগড়া করিতে লাগিল। কেহ বলিল হাতী কুলার মত, কেহ বলিল হাতী নলের মত, কেহ বলিল হাতী উল্টা ধামী, কেহ বলিল হাতী বড় উঁচু, কেহ বলিল হাতী থামের মত, কেহ বলিল হাতী চামরের মত। সকলেই বলিতে লাগিল 'আমার মতই ঠিক'। সুতরাং ঝগড়া চলিতেই লাগিল, কোনরূপ মীমাংসা হইল না। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপই ঘটিয়াছে। ইউরোপীয়েরা সিংহলদ্বীপেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম দেখেন ও সেইখানেই পালি শিখিয়া বৌদ্ধদের বই পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ধর্ম্মনীতির সমষ্টিমাত্র, উহাতে কেবল বলে, 'হিংসা করিও না,' 'মিথ্যা কথা কহিও না,' 'চুরি করিও না,' 'পরস্ত্রীগমন করিও না,' 'মদ খাইও না'। হজ্‌সন্ সাহেব নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম পাইলেন। তিনি দেখিলেন, বৌদ্ধদের অনেক দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন অতি গভীর। কেহ বা শুদ্ধ বিজ্ঞানবাদীমাত্র, কেহ বা তাহাও বলেন না। যে সকল দর্শনের মত আঠার ও উনিশ শতে ইউরোপে প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল, তিনি সেই সকল মত নেপালের পুঁথির মধ্যে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, এ সকল মত বৌদ্ধদের মধ্যে দুই তিন শতে চলিতেছিল। বিশপ বিগাণ্ডেট ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিতে পান। তিনি দেখেন, উহার আকার অন্যরূপ। উহাতে পূজাপাঠ ইত্যাদির বেশ ব্যবস্থা আছে। তিনি দেখেন, বৌদ্ধমঠমাত্রেই এক একটি পাঠশালা। ছোট ছোট ছেলেরা পড়ে। যিনি তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিলেন, তিনি দেখিলেন, সেখানে কালীপূজা হয়, সেখানে মন্ত্রতন্ত্র আছে, হোমযাগ হয়, মানুষপূজা হয়। চীনদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম আবার আর এক রূপ। তাহারা সব মাংস খায়, সব জন্তু মারে; অথচ বৌদ্ধ। জাপানীরা বলে, 'আমরা মহাযান অপেক্ষাও দার্শনিকমতে উপরে উঠিয়াছি।' অথচ আবার তাহাদের মধ্যে এক দল বৌদ্ধ আছে, তাহারা নানারূপ দেবদেবীর উপসনা করে।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম নানাদেশে নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে; কোথাও বা উহা পূর্ব্বপুরুষের উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে,

কোথাও বা ভূতপ্রেত-উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দেহতত্ত্ব-উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও আবার খাঁটি বুদ্ধের মত চলিতেছে, কোথাও খাঁটি নাগার্জ্জুনের মত চলিতেছে। সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের একখানি পূরা ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে! তাহার উপর আবার ভাষার গোল। বুদ্ধের বচনগুলি তিনি কি ভাষায় বলিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার বাড়ী ছিল কোশলের উত্তরাংশে। তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন কোশলে ও মগধে। এই দুই দেশের লোক বুঝিতে পারে এমন কোন ভাষাতে তিনি ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই। যে সকল অতিপ্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না সংস্কৃত, না মাগধী, না কোশলী; এক রূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন 'মিশ্র ভাষা'। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন 'Mixed Sanskrit'। 'বিমলপ্রভা' নামে নয় শতের এক পুঁথিতে আমরা দেখিলাম যে, তৎকালে নানা ভাষায় বুদ্ধের বচন লেখা হইয়াছিল: মগধদেশে মগধভাষায়, সিন্ধুদেশে সিন্ধু ভাষায়, বোটদেশে বোটভাষায়, চীনদেশে চীনভাষায়, মহাচীনে মহাচীনভাষায়, পারশ্যদেশে পারস্যভাষায়, রুক্ষদেশে রুক্ষভাষায়। আমরা জানি পারস্যদেশে মগের ধর্ম্ম চলিত ছিল, অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্নি-উপাসক ও 'জরথুস্ত্র'র শিষ্য ছিল। সে দেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ছিল, এ কথাই শুনি নাই। তাহাদের ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুলি লিখিত হইয়াছিল সে খবরও এই নূতন। রুক্ষদেশ কাহাকে বলে, জানি না, রোম হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, বিমল-প্রভায় বলে, উহা নীলনদীর উত্তর। বিমলপ্রভায় আরও একটি নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়ও বুদ্ধদিগের অনেক সঙ্গীত লেখা হইয়াছিল, এ খবর এ পর্য্যন্ত অতি অল্পলোকেই জানেন।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়া নানামুনির নানামত আছে। যাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়া এবং পালি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করেন, তাঁহারাই যথার্থ বৌদ্ধ। গৃহস্থ-বৌদ্ধদের তাঁহারা বৌদ্ধ বলিতে রাজী নহেন। তাঁহারা বলেন, ত্রিপিটকে যাহা কিছু ব্যবস্থা আছে, সবই বিহারবাসী ভিক্ষুদের জন্য। বিনয়পিটকে যত বিধিব্যবস্থা আছে, সবই ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের তাহাতে স্থান নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, যাহারা "পঞ্চশীল" গ্রহণ করে অর্থাৎ "প্রাণাতিপাত করিব না", "মিথ্যাকথা কহিব না", "চুরি করিব না", "মদ খাইব না", "ব্যাভিচার করিব না"—এই পাঁচটি নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তাহারাও বৌদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলে এক জায়গায় ঠেকিয়া যায়। যে সকল জাতি দিনরাত প্রাণিহিংসা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, যথা জেলে, মালা, কৈবর্ত্ত, শিকারী, ব্যাধ, খেট, খটিক্ প্রভৃতি জাতির বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশের অধিকার একেবারেই থাকে না।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে?

এদিকে আবার যাঁহারা নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবীশুদ্ধই বৌদ্ধ; কারণ, যিনি বোধিসত্ত্ব হইবেন, তাঁহাকে জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। লঙ্কাবাসীর মত আপনাকে উদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এই জন্য নেপাল ও তিব্বতবাসীরা লঙ্কাবাসীদিগকে হীনযান বৌদ্ধ বলেন এবং আপনাদিগকে মহাযান বৌদ্ধ বলেন। এখানে 'যান' শব্দের অর্থ লইয়া অনেক বিবাদবিসম্বাদ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ উহার ইংরাজী করেন Vehicle অর্থাৎ গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'যান' শব্দের অর্থ পন্থ বা মত। আমরা যেমন এখন বলি নানকপন্থী দাদুপন্থী কবীরপন্থী, সেকালে বৌদ্ধেরা সেইরূপ বলিত শ্রাবকযান, প্রত্যেকযান, বোধিসত্ত্বযান, মন্ত্রযান ইত্যাদি। Vehicleএর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মহাযান

বৌদ্ধেরা আপনাদের বড় দেখাইবার জন্য আগেকার বৌদ্ধদিগকে হীনযানী বলিত, আর আপনাদিগকে বোধিসত্ত্বযান বলিত।

মহাযানী বৌদ্ধেরা যদি জগৎই উদ্ধার করিতে বসিলেন, তবে জগৎশুদ্ধই ত বৌদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলেন, 'আমরা বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত, পৌত্তলিক, রাজপূজক, ব্রাহ্মণপূজক প্রভৃতি সকলকেই উদ্ধার করিব'। কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কি, সে কথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না; এইমাত্র বলেন 'যাহার যাঁহাতে ভক্তি, আমরা সেইরূপ ধারণা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব'। এ বিষয়ে কারণ্ডব্যূহে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তুমি কি করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে? জগতে ত নানামুনির নানামত, লোকে তোমার কথা শুনিবে কেন?" তখন করুণামূর্ত্তি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন,—"আমি বিষ্ণুবিনেয়দিগকে বিষ্ণুরূপে উদ্ধার করিব, শিববিনেয়দিগকে শিবরূপে উদ্ধার করিব, বিনায়কবিনেয়দিগকে বিনায়করূপে উদ্ধার করিব, রাজবিনেয়দিগকে রাজরূপে উদ্ধার করিব, রাজভটবিনেয়দিগকে রাজভটরূপে উদ্ধার করিব"। এরূপে তিনি যে কত দেবতার বিনেয়দিগকে কতরূপে উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সেইজন্য উপরে তাহার কয়েকটিমাত্র দেওয়া হইল। এ মতে তাহা হইলে সকলেই বৌদ্ধ। এখন যেমন থিওজফিষ্ট মহাশয়েরা বলেন, "তোমরা যে ধর্ম্মেই থাক, যে দেবতার উপাসনাই কর, ধর্ম্মে এবং চরিত্রে বড় হইবার চেষ্টা করিলেই, তোমরা থিওজফিষ্ট এবং যে কেহ থিওজফিষ্ট হইতে পারে"। এও কতকটা সেইরূপ, তবে ইঁহাদের অপেক্ষা মহাযানী বৌদ্ধদের জগতের প্রতি করুণা কিছু বেশী ছিল। তাঁহারা নিজেই চেষ্টা করিয়া জগৎ উদ্ধার করিতে যাইতেন। তোমার চেষ্টা থাকুক, আর নাই থাকুক, তাঁহারা বলিতেন, "আমরা নিজগুণে তোমায় উদ্ধার করিব"। সেইজন্য মহাযান ধর্ম্মের সারের সার কথা "করুণা"। উঁহাদের প্রধান গ্রন্থের নাম "প্রজ্ঞাপারমিতা"। উহার নানারূপ সংস্করণ আছে; এক সংস্করণ শত সহস্র শ্লোকে, এক সংস্করণ পঁচিশ

হাজার শ্লোকে, আর এক সংস্করণ দশহাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ আটহাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ সাতশত শ্লোকে, আর এক সংস্করণ সকলের চেয়ে ছোট, স্বল্পাক্ষরা—"স্বল্পাক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা",—উহার তিনটি পাতা মাত্র। প্রজ্ঞাপারমিতা আরম্ভ করিতে হইলে কতকটা গৌরচন্দ্রিকা চাই—শেষ করিতে গেলেও কতকটা আড়ম্বর চাই। এই সব বাহ্য আড়ম্বর ছাড়িয়া দিলে উহাতে একটিমাত্র কথা সার—"সকল জীবে করুণা কর"।

মহাযানের মর্ম্ম গীতায় একটি শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। সে শ্লোকটি অনেকেরই অভ্যাস আছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তাস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥

গীতায় এ কথাটি ভগবানের মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মহাযানে এই ভাবের কথা প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের মুখে। বোধিসত্ত্বেরা নির্ব্বাণের অভিলাষী, তাঁহারা মানুষ। ভগবানের মুখে যে কথা শোভা পায়, মানুষের মুখে সে কথা আরও অধিক শোভা পায়। ইহাতে বুঝা যায় তাঁহাদের করুণা কত গভীর।

মহাযান মতে তাহা হইলে জীবমাত্রেই বৌদ্ধ, কিন্তু এ কথায় ত কাজ চলে না। ভারতবর্ষে তখন নানারূপ ধর্ম্ম ছিল, মত ছিল, দর্শন ছিল, পন্থ ছিল, যান ছিল। মহাযান যেন বলিলেন, সকলেই বৌদ্ধ; কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা সে কথা মানিবে কেন? সুতরাং বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এ বিচারের প্রয়োজন চিরদিন ছিল, এখনও আছে। ইহার মীমাংসা কি? বৌদ্ধেরা জাতি মানে না যে, ব্রাহ্মণাদির মত জন্মিবামাত্রই ব্রাহ্মণ হইবে বা ক্ষত্রিয় হইবে বা শূদ্র হইবে, বৈষ্ণব হইবে বা শৈব হইবে। একে ত বৌদ্ধগৃহস্থেরা বৌদ্ধ কিনা তাহাতেই সন্দেহ, তার পর তাহাদের ছেলে হইলে, সে ছেলে বৌদ্ধ হইবে কিনা তাহাতে আরও সন্দেহ। এখনও এ বিষয়ে কোন ইউরোপীয় বা এদেশীয় পণ্ডিতেরা কোন মীমাংসা করেন নাই, কিন্তু শুভাকর গুপ্তের আদিকর্ম্ম রচনা নামক বৌদ্ধদের স্মৃতিতে ইহার এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি

দেওয়া আছে। তিনি বলেন, যে কেহ ত্রিশরণ গমন করিয়াছে সেই বৌদ্ধ।

ত্রিশরণ শব্দের অর্থ—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"ধৰ্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি ধৰ্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি ধৰ্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"

বোধ হয় অতি প্রাচীন কালে ত্রিশরণ গমনের জন্য কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, লোকে আপনারাই ত্রিশরণ গ্রহণ করিত। কিন্তু পরে পুরোহিতের নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা হয়। হস্তসার গ্রন্থে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা আছে। যেমন খ্রীষ্টানের পুত্র হইলেই সে খ্রীষ্টান হয় না, তাহাকে বাপ্টাইজ করিলে তবে সে খ্রীষ্টান হয়, সেইরূপ বৌদ্ধ পিতামাতার পুত্র হইলেও, যতক্ষণ সে ত্রিশরণ গমন না করে, ততক্ষণ তাহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না। বৌদ্ধদের যতগুলি ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম আছে, তাহার মধ্যে যেগুলিকে তাহারা অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে করিত এবং সকলের আগে সম্পন্ন করিত, সেই গুলিকে আদিকৰ্ম্ম বলিত। সেই সকল আদিকৰ্ম্মের মধ্যেও, আবার ত্রিশরণ গমন সকলের আদি। বিমলপ্রভায়ও লেখা আছে, আগে ত্রিশরণ গমন, পরে এই জন্মেই বুদ্ধ হইবার জন্য কালচক্র মতে লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। রত্নত্রয়ের শরণ লইলেই যদি বৌদ্ধ হয় এবং সেরূপ শরণ লইবার জন্য যদি পুরোহিতের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে জেলে, মালা, কৈবর্ত্তদের বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশের আর বাধা রহিল না। বিনয়পিটকে লেখা আছে যে, যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত

হইবে, তাহাকে ভিক্ষু করিতে পারিবে না ও তাহাকে সঙ্ঘে লইতে পারিবে না; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে বেচারী বৌদ্ধ হইতে পারিবে না? শুভাকর গুপ্তের ব্যবস্থায় সে অনায়াসে বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। যে সন্ন্যাস লইবে তাহাকে একজন সন্ন্যাসীকে মুরুব্বি করিয়া সন্ন্যাসীর আখড়ায় যাইতে হইত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাম ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর দলের নাম সঙ্ঘ। যেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করিত তাহার নাম সঙ্ঘারাম। সঙ্ঘারামের মধ্যে প্রায়ই একটি মন্দির থাকিত, তাহার নাম বিহার। সেই মন্দিরের নাম হইতেই বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের আখড়াগুলিকে বিহারই বলিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মের গুরু কে?

শিক্ষানবীস একজন ভিক্ষুকে মুরুব্বি করিয়া সঙ্ঘে উপস্থিত হন। সেখানে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা বুড়া ভিক্ষু, যাহাকে স্থবির বা থেরা বলে, তিনি নবীসকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসার সময় সঙ্গে আর পাঁচ জন ভিক্ষুও থাকা চাই। স্থবির নবীসের নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। তাহার কোন উৎকট রোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজার কোন চাকরী করে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি আরও জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার ভিক্ষাপাত্র আছে কিনা, তাহার চীবর আছে কিনা, অর্থাৎ, ভিক্ষু হইতে গেলে যে সকল জিনিস দরকার, তাহা তাহার আছে কিনা। সে এ সব জিনিস আছে বলিলে, তিনি সঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আপনারা বলুন, এই লোককে সঙ্ঘে লওয়া যাইতে পারে কিনা। যদি আপনাদের ইহাতে কোন আপত্তি থাকে, স্পষ্ট করিয়া বলুন, যদি না থাকে তবে চুপ করিয়া থাকুন।' তিনি এইরূপ তিনবার বলিলে, যদি কোন আপত্তি না উঠিত, তবে তিনি নবীসকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার উপাধ্যায় কে?" সে উপাধ্যায়ের নাম বলিলে, তাঁহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইত। সে উপাধ্যায়ের নিকট সন্ন্যাসীর কি কি কাজ, সব শিখিত। এখনকার

শ্রাবকযানের গুরু

ছেলেরা যেমন মাষ্টার মহাশয়দের মান্য করিয়া চলে, শিক্ষানবীস, শ্রমণেরা, সেইরূপে আপনার উপাধ্যায়কে মান্য করিয়া চলিত। ক্রমে সে সব শিখিয়া লইলে, তাহাতে ও উপাধ্যায়ে কোন প্রভেদ থাকিত না। সঙ্ঘে বসিলে, দুজনের সমান ভোট হইত।

বুদ্ধদেব যখন নন্দকে 'প্রব্রজ্যা" দিয়াছিলেন, তখন তিনি উহাকে বৈদেহমুনির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈদেহমুনি নন্দকে আপনার বন্ধুর মত দেখিতেন, বন্ধুর মত তাহাঁকে পরামর্শ দিতেন ও শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে বৈদেহ-মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন, নন্দ বেশ শিখিতেছে ত?" বৈদেহমুনি যেমন জানিতেন, সমস্ত খুলিয়া বলিতেন। যেখানে বৈদেহ-মুনি নন্দকে কোন বিষয় বুঝাইতে অক্ষম হইতেন, বুদ্ধদেব নিজে গিয়া তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতেন। মহাকবি অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যে বৈদেহমুনি ও নন্দের অনেক কথা লেখা আছে। তাহাতে বেশ দেখা যায়, বৈদেহমুনি নন্দের উপাধ্যায় হইলেও দুজনে পরস্পর বন্ধুভাবেই বাস করিতেন, তাঁহারা পরস্পর আপনাদিগকে সমান বলিয়া মনে করিতেন।

উদাহরণ

মহাযান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে "কল্যাণমিত্র" বলিত। কল্যাণমিত্র শব্দ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল সে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পরলোকের কল্যাণকামনায় গুরু শিষ্যের মিত্র মাত্র। মহাযান-মতাবলম্বীরা দর্শনশাস্ত্রের খুব চর্চ্চা করিতেন। এখানে গুরুশিষ্যে অত্যন্ত প্রভেদ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা হইত না। সঙ্ঘে অধিকার দুজনেরই, সমান থাকিত এবং উভয়ে পরস্পর মিত্র হইতেন।

মহাযানের গুরু

ক্রমে যখন এত দর্শনশাস্ত্র পড়া, এত যোগ ধ্যান করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যখন ভিক্ষুরা বিবাহ করিতে লাগিলেন, প্রকাণ্ড একদল গৃহস্থভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল, তখন মন্ত্রযানের উৎপত্তি হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "মন্ত্র জপ করিলেই, পাঠ, স্বাধ্যায়, তপ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মকর্ম্মেরই

মন্ত্রযানের গুরু

ফল পাওয়া যাইবে। প্রজ্ঞাপারমিতা পড়িতে অনেক বৎসর লাগে, বুঝিতে আরও বেশী দিন লাগে এবং প্রজ্ঞাপারমিতার ক্রিয়াকর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে আরও বেশী দিন লাগে। এত ত তুমি পারিবে না বাপু, তুমি এই মন্ত্রটী জপ কর, তাহা হইলে সব ফল পাইবে।" যখন বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত দাঁড়াইল, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা খুব আঁটাআঁটি হইয়া গেল। তখন তিনটী কথা উঠিল :—'গুরুপ্রসাদ', 'শিষ্যপ্রসাদ', 'মন্ত্রপ্রসাদ', অর্থাৎ গুরুকে ভক্তি করিতে হইবে, শিষ্যকে স্নেহ করিতে হইবে, এবং মন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিবে। যে সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে মন্ত্রযান প্রবেশ করে, সে সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে গুরুশিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানা যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচার্য্য ও শিষ্যের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মত। বাস্তবিকও যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি পিতার কার্য্যই করিবেন। সন্তানের শিক্ষার ভার ত পিতারই, তবে তিনি যদি না পারেন, তবে একজন প্রতিনিধির হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়া দিবেন। শিক্ষক বা আচার্য্য পিতার প্রতিনিধিমাত্র। আচার্য্যের মৃত্যুতে শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত। এখনও যিনি গায়ত্রী উপদেশ দেন, সেই আচার্য্য গুরু মরিলে, ব্রাহ্মণকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শিষ্য গুরুর দাস, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মূলই মন্ত্রযান। মন্ত্রযানের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর সেরূপ সমান ভাবটি রহিল না, একজন বড় ও একজন ছোট হইয়া গেল।

বজ্রযানের গুরু

বজ্রযানে গুরু আরও বড় হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী। এই যানের প্রধান কথা এই যে, দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের বজ্রধর নামে একজন পুরোহিত হইলেন। পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আর একজন বুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে উহারা বুদ্ধগণের পুরোহিত বলিয়া মানিয়া থাকে। বজ্রসত্ত্ব কতকটা আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মতের গুরুদিগকে বজ্রাচার্য্য বলিত।

বজ্রাচার্য্যের পাঁচটী অভিষেক হইত, মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক ও পট্টাভিষেক। তাঁহার দেশীয় নাম গুভাজু, অর্থাৎ, তিনি গুরু, তাঁহাকে সকলে ভজনা করিবে। সুতরাং শিষ্য হইতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রযানে গুরুকে শিষ্যের "প্রসাদ" খুঁজিতে হইত, বজ্রযানে তাহার কোনই দরকার নাই।

সহজযানের গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ লইয়া মহাপাপ কার্য্য করিলেও তাহাতে মহাপুণ্য হইবে। সহজযানের একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যে পঞ্চকাম উপভোগের দ্বারা মূর্খলোক বদ্ধ হয়, গুরুর উপদেশ লইয়া সেই পঞ্চকাম উপভোগ করিয়াই সে মুক্ত হইয়া যায়।

সহজযানের গুরু

গুরু উবএসেঁ অমিঅরস্সু হবহিঁ ণ পীঅই যেহিঁ।
বহুসত্তত্থ মরুত্থলিহিঁ তিসিএ মরিথই তেহিঁ॥

"গুরুর উপদেশই অমৃতরস। যে সকল হাবারা উহা পান না করে তাহারা বহু শাস্ত্রার্থরূপ মরুস্থলীতে তৃষ্ণায় মরিয়া যায়।" গুরুর উপদেশ ভিন্ন সহজপন্থীদের কোন জ্ঞানই হয় না ; আগম, বেদ, পুরাণ, তপ, জপ সমস্তই বৃথা ; গুরুর উপদেশমাত্রই সত্য।

আগম বেঅ পুরাণে পংডিত্তমাণ বহন্তি।
পক্কসিলিফলঅ অলি বা জিম বহেরিত্তঁ ভমঅন্তি॥

"যাহারা আগম, বেদ, পুরাণ পড়িয়া আপনাদের পণ্ডিত মনে করিয়া গর্ব্ব করে তাহারা পক্ক শ্রীফলে অলির ন্যায় বাহিরে বাহিরেই ঘুড়িয়া বেড়ায়"।

এইরূপে যতই বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, গুরুর সম্মানও বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

কালচক্রযানে যে গুরুর মান্য কত অধিক তাহা একটি কথাতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে। লঘুকালচক্রতন্ত্রের টীকা বিমলপ্রভা যিনি লিখিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীক, আপনাকে অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণকায় বা অবতার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তিনি স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর, আর কেহ নহেন। কালচক্রযানের পর

কালচক্রযান

লামাযানের উৎপত্তি। সকল লামাই কোন না কোন বড় বোধিসত্ত্বের অবতার। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। লামাযান ক্রমে উঠিয়া দলাইলামাযানে পরিণত হইয়াছে। দলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার। তিনি মরেন না, তাঁহার কায় মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ হয়। তিনি এক কায় ত্যাগ করিয়া কায়ান্তর ধারণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথমে যে উপাধ্যায় মিত্রমাত্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার।

বৌদ্ধধর্ম্মের এই দৃষ্টান্ত হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ করিয়াছে। তন্ত্রমতে গুরুই পরমেশ্বর, গুরুর পাদপূজা করিতে হয়, যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে নিষেধ, সেই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়; গুরু শিষ্যের সর্ব্বস্বের অধিকারী, যে শিষ্য ধনজন, আপন স্ত্রীপুত্র ও দেহ পর্য্যন্ত গুরুসেবায় নিয়োগ করিতে পারে সেই পরম ভক্ত। বৈষ্ণবের মতেও তাই। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে এখন কর্ত্তাভজা হইতেছেন। তাঁহারা বলেন "গুরু সত্য, জগন্মিথ্যা, যা করাও তাই করি, যা খাওয়াও তাই খাই, যা বলাও তাই বলি।"

নির্ব্বাণ

বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝিতে হয়; এবং সেই সকল কথা বুঝিয়া উঠাও অতি কঠিন। মোটামুটি ধরিতে গেলে নির্ব্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, তেমনিই মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া গেলে কিছু থাকেনা; মানুষ নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ কথাটা, শুনিতে যত সোজা, ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর কিছু নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল; কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায়? একেবারে 'নিহিল' হইয়া যায়? একেবারে 'এনিহিলেসন' হইয়া যায়? একেবারে 'নাস্তি' হইয়া যায়? এইখানেই গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব না, এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করিব, শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্য? এ ত বড় শক্ত কথা।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন। এইজন্য অনেক পাদরী সাহেবেরা বলেন বৌদ্ধেরা নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী। বুদ্ধ নিজে কি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নির্ব্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার বক্তৃতার যেরূপ রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাও, আবার, তিনি ঠিক যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সে ভাষার কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেই রিপোর্টমাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহিতই নির্ব্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্ব্বাণের পর কি থাকে। সুতরাং নির্ব্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যেরা সেটা ভাবিতেও যেন ভয় পাইত।

বুদ্ধদেব সে কথার কি জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত বৎসরের পর, কনিষ্ক রাজার গুরু অশ্বঘোষ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিরার জন্য একখানি কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যেমন তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি এই কঠিন বৌদ্ধধর্ম্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছি। তিনি নির্ব্বাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান গুরু এবং প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার কথা আমাদের মন দিয়া শুনা উচিত। তিনি বলিয়াছেন :—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
এবং কৃতী নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

"প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যায় না; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটীরও শেষ; সাধকও তেমনই ভাবে, নির্ব্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান না, আকাশেও যান না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারও সব ফুরাইয়া গেল, সব শান্ত হইল।"

এখানে কথা হইতেছে "উপৈতি শান্তিম্"—'সব শেষ হইয়া গেল' —ইহার অর্থ কি নিহিল? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্বঘোষও নির্ব্বাণের পর আর কিছু থাকিল কি না, কিছুই বলিলেন না। এই দুইটি কবিতার পরই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন

কিন্তু এই কবিতা দুইটির পূর্ব্বে যে তিনটি কবিতা আছে, তাহা পড়িলে, নির্ব্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ, এরূপ বোধ হয় না। সে তিনটি কবিতা এই,—

তজ্জন্মনো নৈকবিধস্য সৌম্য
তৃষ্ণাদয়ো হেতব ইত্যবেত্য।
তাংশ্ছিন্ধি দুঃখাদ্‌যদি নির্ম্মুমুক্ষা
কার্য্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষয়াদ্ধি ॥
দুঃখক্ষয়ো হেতু-পরিক্ষয়াচ্চ
শান্তং শিবং সাক্ষিকুরুষ্ব ধর্ম্মম্‌।
তৃষ্ণাবিরাগং লয়নং নিরোধং
সনাতনং ত্রাণমহার্য্যমার্য্যম্‌ ॥
যস্মিন্নজাতির্ন জরা ন মৃত্যুঃ
ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্প্রযোগঃ।
নেচ্ছাবিপন্ন প্রিয়বিপ্রযোগঃ
ক্ষমং পদং নৈষ্ঠিকমচ্যুতং তৎ ॥

"অতএব তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে ছেদ কর। যেহেতু, কারণের ক্ষয় হইলে, কার্য্যেরও ক্ষয় হইবে।

"এখানে তৃষ্ণাদি হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখেরও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি "ধর্ম্ম"কে প্রত্যক্ষ কর। এ "ধর্ম্ম" শান্তিময়, মঙ্গলময়, ইহাতে তৃষ্ণার উপর বিরাগ হয়, ইহা গুহার মত, ইহাতে সর্ব্বধর্ম্মের নিরোধ হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"ইহাই চরম ও অচ্যুত পদ। ইহাতে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই, শত্রুসমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয়-বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মতন জিনিস।"

যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্ব্বাণের ঐ দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্ব্বাণশব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই।

তিনি বুঝিয়াছেন যে নির্ব্বাণের পর আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কি উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক্। "নির্ব্বাণের পর কিছু থাকিবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "থাকিবে না কি?" উত্তর হইল "না"। "থাকা না থাকার মাঝামাঝি কোন অবস্থা হইবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "কিছু থাকা না থাকা এদু'য়েরই বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থা হইবে কি?" আবার উত্তর হইল "না"।

তবে দাঁড়াইল কি? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থায় "অস্তি"ও বলিতে পারিনা, "নাস্তি"ও বলিতে পারিনা। এদু'য়ে জড়াইয়া কোন অবস্থা নয়, এদু'য়ের অতিরিক্ত কোন অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল কোন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে।

এই অবস্থাকেই মহাযানে "শূন্য" বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। "শূন্য" বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বলেন "আমরা করি কি? আমরা যে ভাষায় শব্দ পাই না। নির্ব্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা যে বাক্যের অতীত। ঠিক কথাটি পাইনা বলিয়াই আমরা উহাকে "শূন্য" বলি। কিন্তু শূন্যশব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত। 'অস্তিনাস্তিতদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্'।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার তর্কবাদে শূন্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যাহাদের মতে সবই শূন্য, তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কি করিব?" তিনি বৌদ্ধদের "বিনাশবাদী" বলেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িকেরা "অর্দ্ধবিনশন" অর্থাৎ আধখানা বিনাশবাদী। কেননা, নৈয়ায়িকেরাও বলেন, "অত্যন্ত সুখদুঃখ-নিবৃত্তি'র নামই "অপবর্গ'। সুখদুঃখ যদি একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা ত পাথর

হইয়া গেল। তাই শঙ্করের পর মহাকবি শ্রীহর্ষ গৌতম ঋষিকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন :

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমুচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিথ তথৈব সঃ ।।

অর্থাৎ যে গোতম জীবন্ত প্রাণীকে পাথর করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নামটী সার্থক হইয়াছে। তিনি গোতমই বটেন—তাঁহার মত গরু আর দ্বিতীয় নাই।

সাধারণ লোকে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভাল। কেননা, কিছু আছে দেখিতে পাইব। শূন্য হইলে ত কিছুই থাকিবে না।

যাহা হোক অশ্বঘোষ যে নির্ব্বাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষার পুস্তকে উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নির্ব্বাণ একটি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। শুধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কাণ্ট ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল বলিয়া গিয়াছেন? কেননা, ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়াইয়া যায়, মানুষে ইহা ধারণা করিতে পারে না।

এরূপ অনির্ব্বচনীয় না বলিয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যুতপদ আছে, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার করনা কেন? কিন্তু অস্তি বলিলে, একটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ "অহং" এই বুদ্ধিটি থাকিবে। অহংজ্ঞান থাকিলেই অহঙ্কার হইল। অহঙ্কার থাকিলেই সকল অনর্থের যা মূল তাই রহিয়া গেল। সুতরাং সে যে আবার জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। আরও কথা, আত্মা যখন রহিলই, তখন তাহার ত গুণগুলাও রহিল। অগ্নি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আত্মা থাকিলে তাহার একত্ব-সংখ্যা থাকিবে। একত্ব-সংখ্যাও ত একটি গুণ। সে আত্মার জ্ঞান থাকিবে? না, থাকিবেনা? যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞেয় পদার্থ থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে আত্মা আত্মাই নয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বুদ্ধদেব

বলিতেছেন, "আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না।" তাঁহার প্রথম গুরু অরাড় কালামের সহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে উহারা বলে আত্মা দেহনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-নির্ম্মুক্ত হইলেই মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আত্মাকে "চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত" করিয়া তবে তৃপ্ত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যেরা, আত্মাকে শূন্যরূপ, অনির্ব্বচনীয়রূপ, চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্তরূপ, মনে করিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নির্ব্বাণকে অভাব বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মতে সংসার হইল ভাব পদার্থ এবং নির্ব্বাণ অভাব। ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও নির্ব্বাণ বুঝিতেন। তাহারও পরে আবার যখন তাহারা দেখিল, যে প্রকৃত পক্ষে ভব বা সংসার সেও বাস্তবিক নাই, আমরা ব্যবহারতঃ তাদিগকে "অস্তি" বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম্ম অতি সহজ হইয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল—

অপণে রচিরচি ভব নির্ব্বাণা।
মিছা লোক বন্ধাবএ অপণা॥

অর্থাৎ ভবও শূন্যরূপ, নির্ব্বাণও শূন্যরূপ। ভব ও নির্ব্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্ব্বাণও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বদ্ধ করে। কিন্তু পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শূন্যময়।

তাহা হইলে ত বেশ হইল। ভবও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য, সুতরাং আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, স্বভাবতঃই মুক্ত, "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ"। তবে আর ধর্ম্মেই কাজ কি? যোগেই কাজ কি? কঠোরেই বা কাজ কি? ধ্যানেই বা কাজ কি? সমাধিতেই বা কাজ কি? ধর্ম্ম অধর্ম্মেই বা কাজ কি? যার যা খুসি কর। তোমরা স্বভাবতঃই মুক্ত, কিছুতেই তোমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। পরম যোগীও যেমন মুক্ত, অতিপাপিষ্ঠও তেমনই মুক্ত।

এই জায়গায় সহজিয়া বৌদ্ধ বলিল যে মূঢ় লোক ও পণ্ডিত লোকের মধ্যে একটি ভেদ আছে। সকলেই স্বভাবতঃ মুক্ত বটে, কিন্তু মূঢ় লোকে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা আপনাদের বদ্ধ করিয়া ফেলে, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চকামোপভোগ করিলে, কিছুতেই বদ্ধ হয় না।

"যেনৈব বধ্যতে বালো বুধস্তেনৈব মুচ্যতে"। যে পঞ্চকামোপ-ভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্খ লোকে বদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহাতেই মুক্ত হয়।

আর এক উপায়ে নির্ব্বাণ ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের জন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সৎপথে বা ধর্ম্মপথে বা সদ্ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে যেমন তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে অধিক উচ্চ উচ্চ লোকে উঠিতে লাগিল। যদি তাহার উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে সে এই জন্মেই বোধি লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধদের বিহারে যে সকল স্তূপ দেখা যায়, সেই স্তূপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে। স্তূপগুলি প্রথমে একটি গোল নলের উপর খানিক দূর উঠিয়াছে। তাহার উপর একটি গোলের অৰ্দ্ধেক। তাহার উপর একটি নিরেট চারকোণা জিনিস। তাহার উপর একটি ছাতা। তাহার উপর আর একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাতা হইতে একটু বড়। তাহার উপর আর একটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর একটু বড়। চতুর্থটি তৃতীয় ছাতার অপেক্ষা একটু ছোট, পঞ্চমটি আরও ছোট। এইখানে এক সেট ছাতা শেষ হইয়া গেল। তাহারও উপর ছাতার খানিকটা বাঁট মাত্র। এই বাঁটের পর আবার আর এক সেট ছাতা, কোন মতে ১৩টি, কোন মতে ১৬টি, কোন মতে ২১টি, কোন মতে ২৩টিও দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার মোচার আগার মত আর একটি জিনিস। মোচার

আগাটি বেড়িয়া উপরি উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে। মোচার আগাটি একেবারে ছুঁচের মত।

বোধিচিত্ত প্রণিধিবলে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি এই স্তূপে উঠিতে লাগিলেন। স্তূপের নীচের দিক্‌টা ভূত-প্রেত-পিশাচ-লোক ও নরক। তাহার উপর যে গোলের আধখানা আছে, সেটি মনুষ্যলোক। বোধিচিত্ত মানুষেরই হয়। সুতরাং সে চিত্ত এইখান হইতেই উঠিতে থাকে। প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা সে ঐ নীরেট চারিকোণায় উঠিল। এটি চারিজন মহারাজার স্থান, তাঁহারা চারিদিকের অধিপতি। তাঁহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বৈশ্রবণ ও বিরূপাক্ষ। তাহার উপর ত্রয়স্ত্রিংশ ভুবন। এখানকার রাজা ইন্দ্র এবং ৩৩ জন দেবতা এখানে বসবাস করেন। ইহার উপর তুষিত ভুবন। বোধিসত্ত্বেরা এইখান হইতে একবারমাত্র পৃথিবীতে গমন করেন এবং সেখানে গিয়া সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হন। ইহার পর যামলোক। ইহার পর নির্ম্মাণরতিলোক, অর্থাৎ, ইঁহারা ইচ্ছামত নানারূপে নানা ভোগ্যবস্তু নির্ম্মাণ করিয়া উপভোগ করিতে পারেন। ইঁহাদের পরে যে লোক, তাহার নাম পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, অর্থাৎ, তাঁহারা নিজে কিছুই নির্ম্মাণ করেন না, পরে নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত আসিয়া কামধাতু শেষ হইয়া গেল, অর্থাৎ, এইখানে আসিয়া বোধিচিত্তের আর কোন ভোগের আকাঙ্ক্ষা রহিল না।

এইখান হইতে রূপলোকের আরম্ভ। কাম নাই, রূপ আছে, আর আছে উৎসাহ। সে উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে বোধিচিত্ত ক্রমশঃই উঠিতে লাগিলেন। রূপধাতুতে, প্রধানতঃ, চারিটি লোক; অবশিষ্ট লোকগুলি এই চারিটিরই অধীন। এই চারিটি লোক লাভ করিতে হইলে, বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্কের লোপ হইয়া যায়, প্রীতি ও সুখে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি লোপ হইয়া যায়, কেবল মাত্র সুখ থাকে। চতুর্থ ধ্যানে সুখও লোপ

হইয়া যায়, তখন বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চান।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিত্ত আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। রূপলোক ছাড়াইয়া অরূপলোকে উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপনাকে, সমস্ত বস্তু, এমন কি নীরেট জিনিসটি পর্য্যন্ত তিনি আকাশ মাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাহার নিকট অনন্ত ও উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে কিছুই কিছু নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহা কিছুই নয়। ইহারও উপর বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলে তখন তাহার চিন্তা হইল এই যে কিছুই নয়, ইহার কোন সংজ্ঞা আছে কিনা। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞীও আছে। কিন্তু সংজ্ঞী ত নাই, সে ত অকিঞ্চন। সুতরাং সংজ্ঞাও নাই, সংজ্ঞীও নাই। ইহার পর বোধিচিত্ত সেই মোচার আগায় উঠিলেন। এই যে স্তূপ ইহাই "ত্রৈধাতুক লোক" তিনি এখন ইহার মাথার উপর। তাঁহার চারিদিকে অনন্তশূন্য, আর তাঁহার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি সেইখান হইতে অনন্তশূন্যে ঝাঁপ দিলেন। যেমন নুণের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ বোধিচিত্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্তশূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম ও বিনয় অনন্তকালের জন্য ত্রৈধাতুক-লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্ব্বাণ বলিতে 'নাই' 'নাই'ই বুঝায়। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা এই 'নাই' 'নাই' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। নির্ব্বাণ হইয়া গেলে, একটা অনির্ব্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল শূন্য হওয়াই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন; উহার নাম 'করুণা'। ইহা যেমন তেমন করুণা নয়, সর্ব্বজীবে করুণা,

সর্ব্বভূতে করুণা। রূপধাতু ত্যাগ করিয়া অরূপধাতুতে আসিয়া যেমন সকল পদার্থকেই আকাশের ন্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন। শুদ্ধ 'শূন্যতা' লইয়া যে নির্ব্বাণ, প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিস্পন্দ, কতকটা পাথরের মত, কতকটা শুকনা কাঠের মত হইয়াছিল; করুণার স্পর্শে, তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল; নির্জ্জীবে জীবন আসিল, উদ্দেশ্যশূন্যে উদ্দেশ্য আসিল, সত্য সত্যই শুষ্কতরু যেন মুঞ্জরিয়া উঠিল। যাঁহারা অর্হৎ হওয়াই, অর্থাৎ কোনরূপে আপনাদের মুক্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, সমস্ত জগৎ যাঁহাদের চক্ষে থাকিলেও হইত, না থাকিলেও হইত। জগতের পক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা আর তত বড় বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমিত্বটুকু লোপ করিব, আমি মুক্ত হইব, আর আমার চারিদিকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ্য হয়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সংসারের সকল গণ্ডী পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসত্ত্বের যা কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমন কি ধর্ম্মস্তূপের আগায় উঠিয়া শূন্যতা ও করুণাসাগরে ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারিদিকে কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আমিত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আয়তন আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে; জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিসের কোলাহল'। তাহারা উত্তর করিল 'আপনি করুণার অবতার আপনি যদি নির্ব্বাণ লাভ করেন, তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে?' তখন অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন 'যতক্ষণ জগতের একটিমাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণ লইব না।'

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতে বৌদ্ধরা ভারতবর্ষে এই মত লইয়াই চলিত। ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলিত। তাহারা মনে করিত এত বড় মত আর হইতে পারে না। যখন বোধি-

সত্ত্বেরা করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহারা জীবের উদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বুদ্ধদেব যে পঞ্চশীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্য্যদেব 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণে' বলিয়া গিয়াছেন 'যে জগৎ উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহার যদি কোন দোষ হয়, সে দোষ একেবারে ধর্ত্তব্যই নয়।'

এই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, ধর্ম্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এইমতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড় বড় রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এত লোকে এতশত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

চাণক্য শ্লোকে বলে 'ধন উপায় করা বড় সহজ, কিন্তু ধন রাখা বড় কঠিন।' জ্ঞানেরও তাই, জ্ঞান উপার্জ্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানটি রক্ষা করা বড় কঠিন। মহাযানেরও এই জ্ঞান বেশীদিন রক্ষা হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা করিয়া বহুকাল যোগ-সাধনা করিয়া মহাযান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজ মত বাহির করিতে হইবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া যজমানদিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন: তাঁহাদের আর চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না, সে স্বাধীনতাও রহিল না।

কিন্তু নির্ব্বাণের কথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক বাহিরের কথা বলিয়া ফেলিলাম। বোধ হয় এগুলি না বলিলে হইত না। মহাযানের নির্ব্বাণ 'শূন্যতা' ও 'করুণায়' মিশামিশি। এ নির্ব্বাণের একদিকে 'করুণা', আর একদিকে 'শূন্যতা', করুণা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু যে সকল যজমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেশী নির্ভর করিতে লাগিলেন,

তাহাদিগকে শূন্যতা বুঝান বড়ই কঠিন। তাঁহারা শূন্যতার বদলে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন—সেটি "নিরাত্মা"। নিরাত্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধা যায় না, কিন্তু এসময় বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যজমানদিগকে বুঝাইলেন যে বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন 'নিরাত্মা', সুধু নিরাত্মা বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন "নিরাত্মাদেবী", অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সে কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল; কেননা সেটা বুঝিতে ত কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। এখন নির্ব্বাণের অর্থ কি দাঁড়াইল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর ঠিক ঐ সময়েই, যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সে কথাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইল না। সুতরাং নির্ব্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ নির্ব্বাণেও সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও

নির্ব্বাণ কয় রকম ?

থেরাবাদী বুদ্ধেরা ও প্রকৃত বুদ্ধেরা মনে করিতেন, মানুষ যদি সদুপদেশ পাইয়া, অথবা, নিজে মনে মনে গড়িয়া লইয়া চারিটি আর্য্যসত্যে বিশ্বাস করে, আট রকম নিয়ম মানিয়া চলে, তাহা হইলে বহুকাল অভ্যাসের পর, তাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়। এইরূপ যাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়, তাহাদের সোতাপন্ন বলে। স্রোতে পড়িলে যেমন সে আর উজান যাইতে পারে না, ভাটিয়াই যায়, সেইরূপ সোতাপন্ন নিষ্ঠাণের দিকেই যাইতে থাকেন, সংসারের দিকে তিনি আর কখন ফিরিয়া আসেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তিনি আর উজান বহেন না।

সোতাপন্ন আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি "সকৃদাগামী" হয়েন, অর্থাৎ, তিনি আর একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব এই 'সকৃদাগামী' অবস্থাতেই তুষিতভবনে বাস করিতেছিলেন। তিনি আর একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিলেন ও নির্ব্বাণ পাইয়া গেলেন।

সকৃদাগামী আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ান, তাহাকে "অনাগামী" অবস্থা বলে। এ অবস্থায় আসিলে আর ফিরিতে হয় না। ইহার পরের অবস্থার নাম অর্হৎ। অর্হৎ যদিও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকেন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি যে নির্ব্বাণ পাইয়া থাকেন, তাহার নাম "স্বউপাদি সেস নিব্বাণ" বা স্ব উপাধি শেষ নির্ব্বাণ। ইহা নির্ব্বাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে পুনর্জ্জন্মের কিছু কিছু "উপাদান" এখনও শেষ আছে; অথবা সকল কর্ম্ম এখনও ক্ষয় হয় নাই। আরও সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে—কর্ম্ম হইতে যে সংস্কার জন্মে তাহার কিছু কিছু এখনও রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থায় অর্হৎ কিছুদিন থাকিলে, তাঁহার কর্ম্মের ক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর হয় না। ক্রমে সব কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই তিনি "নিরুপাদি সেস নিব্বাণ ধাতু"তে প্রবেশ করেন—অর্থাৎ তখন তাঁহার কর্ম্মও থাকে না, কর্ম্ম হইতে

উৎপন্ন সংস্কারও থাকে না। তিনি নির্ব্বাণে প্রবেশ করেন, সব ফুরাইয়া যায়।

মহাযানীরা বলেন 'এই যে হীনযানীদের নির্ব্বাণ, ইহা নীরস, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, এবং ইহাতে অতি সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। হীনযানীরা ও প্রত্যেক যানীরা জগতের জন্য একেবারে 'কেয়ার' করেন না। তাঁহাদের কাছে জগৎ থাকা না থাকা দুইই সমান। নির্ব্বাণ পাইয়াও তাঁহারা কাঠের বা পাথরের মত হইয়া যান। ও নির্ব্বাণ, যাহারা বুদ্ধিমান, যাহাদের শরীরে দয়ামায়া আছে, যাহাদের হৃদয় আছে, যাহারা শুধু আপনার সুখের জন্য বাস করে না, যাহারা পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। তাহারা নির্ব্বাণের অনুরূপ অর্থ করিয়া লইবে।

মহাযানীরা মনে করেন যে, নির্ব্বাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ 'না' 'না' করিয়া দেখিলে চলিবে না। উহাকে বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক্ হইতেই দেখিতে হইবে। আত্মার নাশের নাম নির্ব্বাণ, জ্ঞানের নাশের নাম নির্ব্বাণ, বুদ্ধির নাশের নাম নির্ব্বাণ—এই যে হীনযানীরা 'না'র দিক্ হইতে উহাকে দেখিয়া থাকেন, উহা বুদ্ধের মনের কথা হইতে পারে না। তিনি 'চতুরার্য্যসত্য' ও আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বা আটটি সুপথ ধরিয়া চলার নামই নির্ব্বাণ। তাঁহার মতে মনুষ্য হৃদয়ের যত আশা আকাঙ্ক্ষা, সব শান্ত করিয়া দেওয়ার নাম নির্ব্বাণ নহে; সেই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে দেওয়ার নামই নির্ব্বাণ। কিন্তু সে আশা বা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাহার ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিতে হইবে।

দেখান গেল যে, মহাযান নির্ব্বাণ 'না'র দিক্ হইতে নয়, 'হাঁ'র দিক্ হইতে বুঝিতে হইবে। নিরালম্ব নির্ব্বাণে বোধিচিত্ত যে কেবল ক্লেশপরম্পারা হইতে মুক্ত হন, এরূপ নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুক্ত হন। তখন বোধিচিত্ত ধর্ম্মকায়ের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। দুট জিনিস তখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে—(১) সর্ব্বভূতে করুণা, (২) ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান। যিনি এইরূপে 'সম্যক্ সম্বোধি' লাভ করিয়াছেন, তিনি সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, নির্ব্বাণেও তখন তাঁহার আস্থা নাই। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য

হইয়াছে সর্ব্বজীবের পরিত্রাণ ও তাহার জন্য তিনি আপনাকে বারংবার বদ্ধ করিতেও কাতর হন না। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী-প্রজ্ঞাবলে তিনি পদার্থের সত্যাসত্য দেখিতে পান। তাঁহার জীবন তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মময় হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে বলিতেছে, 'সমস্ত প্রাণীকে মুক্ত কর ও চরমানন্দে ভাসাইয়া দাও।' তিনি নির্ব্বাণেও তৃপ্তি লাভ করেন না, নির্ব্বাণেও তিনি বসতি করিতে পারেন না, তাঁহার কি ভব, কি নির্ব্বাণ কোনই আলম্বন নাই, এইজন্য তাঁহার নির্ব্বাণের নাম নিরালম্ব নির্ব্বাণ।

মহাযানীদের আর একরকম মুক্তি আছে। এ মুক্তি ভব ও নির্ব্বাণের অতীত। ইহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মকায়ের সহিত এক। আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি, সাধারণ লোক যাহাকে তথ্য বলে, মহাযানীরা তাহাকে তথতা বলে। ধর্ম্মের যে তথতা তাহার নাম ধর্ম্মকায়। যিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি তথাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমসত্যে আগত হইয়াছেন।

সে পরম সত্যটি কি? জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার তলায় যে নিগূঢ় সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্ম্মকায়। ধর্ম্মকায় হইতেই নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়। ধর্ম্মকায় মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীনযানীরা জগতের আদিকারণ নির্ণয় করিতেই যান নাই। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মকায় বলিতে বুদ্ধের ধর্ম্ম ও তাঁহার শরীর বুঝাইত। অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মকায় বলিতে বেদান্তের পরমাত্মা বুঝায়, কিন্তু সে কথা সত্য নয়। নির্গুণ পরমাত্মা অস্তিত্ব মাত্র। ধর্ম্মকায়ের ইচ্ছা আছে, বিবেকশক্তি আছে, অর্থাৎ, ইঁহার করুণা আছে ও বোধি আছে। সকল সজীব পদার্থই এই ধর্ম্মকায়ের প্রকাশমাত্র।

নির্ব্বাণ বলিতে চৈতন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় না। নির্ব্বাণে নিরোধ করে কি? কেবল অহংভাবেরই ইহাতে নিরোধ করে। ইহাতে বলিয়া দেয় যে অহং বলিয়া যে একটা পদার্থ কল্পনা করা হয়, তাহা অলীক ও এই অলীক কল্পনা হইতে আরও যত ভাব উঠে, সে সবও অলীক। এতটুকু ত গেল কেবল 'নিষেধমুখে' অর্থাৎ 'না'র দিক হইতে। বিধিমুখে

অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক্ হইতেও ইহার একটা অর্থ আছে। সেটি করুণা—সর্ব্বভূতে দয়া। এই দুইটা জিনিষ লইয়াই নির্ব্বাণ সম্পূর্ণ হয়। হৃদয় যখন অহংভাব হইতে মুক্ত হইল, অমনি, যে হৃদয় এতক্ষণ সঙ্কীর্ণ ও অলস ছিল, তাহা অনন্দে উৎফুল্ল হইল, নূতন জীবনের ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া বন্দী বাহির হইয়া পড়িল। এখন সমস্ত জগৎই তাহার এবং সেও সমস্ত জগতেরই। সুতরাং একটি প্রাণীও যতক্ষণ নির্ব্বাণ পাইতে বাকী থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার নির্ব্বাণ পাইয়া লাভ কি? নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

একজন বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন, "অবিদ্যা হইতে বাসনার উৎপত্তি এবং সেই বাসনা হইতে আমার পীড়ার উৎপত্তি। সমস্ত সজীব পদার্থ পীড়িত সুতরাং আমিও পীড়িত। যখন সমস্ত সজীব পদার্থ আরোগ্য লাভ করিবে, তখন আমিও আরোগ্য লাভ করিব। কিসের জন্য বোধিসত্ত্ব জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা স্বীকার করেন? কেবল জীবের জন্য। জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই পীড়া থাকে। যখন জীবের পীড়ার উপশম হয়, বোধিসত্ত্ব রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। যখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান পীড়িত হয়, তখন পিতামাতারও পীড়া উপস্থিত হয়। সে সন্তান নীরোগ হইলে পিতামাতাও নীরোগ হন। বোধিসত্ত্বেরও ঠিক সেইরূপ। তিনি সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মত ভালবাসেন। তাহারা পীড়িত হইলেই তিনি পীড়িত হন, তাঁহারা নীরোগ হইলেই তিনি নীরোগ হন। তুমি কি শুনিতে চাও কেন বোধিসত্ত্ব এরূপ পীড়িত হন? তিনি মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়িত হন।"

কোথা হইতে আসিল ?

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আদি কি ? এ কথা লইয়া বহুকাল হইতে বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়েও নানা মুনির নানা মত; এখনও কিছুই ঠিক হয় নাই। যাঁহার যেমন পড়াশুনা, যাঁহার যে শাস্ত্রে কৃতিত্ব, যিনি যে শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করেন, তিনিই আপনার মনের মত একটা আদি ঠিক করিয়া লন এবং সেই মতই প্রচার করেন। অনেকে আবার দুই চারি জনের মত লইয়া একটা সামঞ্জস্য করিতে গিয়াছেন। এইরূপে মত বহু সংখ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মত লোকে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না, যতই আলোচনা করে ততই ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। তাই সেই মতগুলির একবার চর্চ্চা করা আবশ্যক হইয়াছে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আদি কি ?

প্রথম মত এই যে, বুদ্ধদেব যজ্ঞে হাজার হাজার পশুবধ হয় দেখিয়া দয়ায় গলিয়া যান, ও যাহাতে পশুবধ নিবারণ হয়, তাহারই জন্য অহিংসা পরম-ধর্ম্ম—এই মত প্রচার করেন। বাস্তবিক তখন যজ্ঞে যে বিস্তর পশুবধ হইত সে বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে একটি ঘোড়া ও একটি ভেড়া মারার কথা আছে। কিন্তু যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে ঐ একটি ভেড়ার জায়গায় একটি হাজার ভেড়া বধের কথা আছে। তাহার পর সোমযাগ ত পশুবধ ভিন্ন হইতে পারিত না। সোমযাগ যে কত রকম ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং কত পশু যে মারা হইত তাহারও ইয়ত্তা নাই। তাই দেখিয়া পশুবধ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। এ মত বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও আছে। রামচন্দ্র কবিভারতী—যিনি বঙ্গদেশ হইতে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া তথাকার রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হন এবং বৌদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী এই উপাধি পান—তিনি নিজে প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধদেব যে বেদনিন্দা করিতেন একথা তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন,—বুদ্ধদেব শুদ্ধ সেই সকল শ্রুতির নিন্দা

যজ্ঞে পশুবধ নিবারণ।

করিয়াছেন যাহাতে পশুবধের কথা আছে। সমস্ত বেদের নিন্দা তিনি একেবারেই করেন নাই।

জয়দেবও বুদ্ধ অবতারের স্তব করিতে গিয়া বলিলেন,

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্

অর্থাৎ তিনি মাত্র যজ্ঞবিধির শ্রুতিগুলির নিন্দা করিয়াছেন, অন্য শ্রুতির নিন্দা করেন নাই।

উপনিষদ্-ধর্ম্মের পরিণাম।

দ্বিতীয় মত এই যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে উপনিষদের অদ্বৈত মত চলিয়া আসিতেছিল, বুদ্ধদেব সেই মতই আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার একটি নামই অদ্বয়বাদী। তাঁহার নির্ব্বাণ ও উপনিষদের অদ্বয়বাদে বিশেষ কিছু তফাৎ নাই। তবে বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিনীর গ্রন্থকার চিরঞ্জীব শর্ম্মা যেমন বলিয়াছেন, "তুমি বল আছে আছে আমি বলি নাই।" তোমার আমার এই কথার ভেদমাত্র, বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে রামানুজের দল—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং
প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ।

বলিয়া গালি দিয়াছেন। তবে এ গালিতেও ঐ মতে একটু তফাৎ আছে। রামানুজীরা বলেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন, আর ওমতে বলে, উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব অদ্বয়বাদী হইয়াছেন।

সাংখ্যমতের পরিণাম।

তৃতীয় মত এই যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাংখ্যমতের পরিণাম। সাংখ্যমত বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যমতে যেমন দর্শনসম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি গণিয়া সংখ্যা করিয়া রাখে, বুদ্ধমতেও তাই। সাংখ্যের অষ্টবিকৃতি, তিন প্রমাণ, পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদি, বুদ্ধেরও সেইরূপ পঞ্চ স্কন্ধ, চতুরার্য্য সত্য, আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতি। সাংখ্য-দর্শন যেমন ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল, বুদ্ধদর্শনও তেমনি ত্রিতাপ-

নাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল। সেই ত্রিতাপনাশ করিতে গিয়া সাংখ্যগণ বলিয়াছিল, আত্মাকে কেবল, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য, করিয়া দিতে পারিলেই ত্রিতাপ নাশ হয়। বুদ্ধ বলিলেন, না, সে হইতেই পারে না, কারণ আত্মা থাকিলেই তাহা "কেবল" হইয়া থাকিতে পারে না. অতএব আত্মাই নাই বলিতে হইবে।

ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও প্রাধান্য দমনের জন্যই বৌদ্ধ-মত

অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণেরা সে সময়ে বড় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভূদেব বলিয়া মনে করিতেন। অন্য যে কেহই হউক না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াই থাকিতে হইবে। বুদ্ধদেব এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আপামর সকলকেই মুক্তির উপদেশ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার দ্বেষই ধর্ম্মপ্রচারের কারণ। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত একথা একবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে কিছুমাত্র দ্বেষভাব ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি চন্দ্রকীর্ত্তির টীকার সহিত আর্য্যদেবের চতুঃশতিকার কিয়দংশ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে আচার্য্য সংঘসেন একজন বালকের সেবায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষা লইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, "আর কিছুদিন যাউক, আমি দীক্ষা লইব।" মাস খানেক পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য্য, আমি এখন 'দীক্ষিত'।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে তোমার দীক্ষা হইল?" সে বলিল, "এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই আমার ইচ্ছা হয় যে আমি তাহাকে মারিয়া ফেলি, সুতরাং আমি বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত।"

বুদ্ধদেব শক-জাতীয়, তাহার ধর্ম্ম শকজাতীয় ধর্ম্ম।

আবার একদল আছেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মিয়াছিলেন। শাক্য শব্দ শক শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনিও শক ছিলেন। শকেদেরই ধর্ম্ম তিনি প্রচার করেন। শকেরা কোনও কালে হিমালয়ের উচ্চ শিখর উত্তীর্ণ হইয়া কপিলবাস্তুতে বাস করিয়াছিল, তাহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিত, সুতরাং তাহারা কিছুতেই আর্য্য হইতে পারে না। অনেক

শকজাতীয় রাজারাও আপনাদিগকে শাক্যবংশের লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি বলিয়া গৌরব করিতেন।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে, বুদ্ধদেবের গল্পটি সত্য নহে। উহা ইতিহাস নহে, উহা সূর্য্যসম্বন্ধীয় একটি প্রাচীন কল্পিত আখ্যায়িকা মাত্র। শাল গাছে ভর করিয়া মা দাঁড়াইলেন ও মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব জন্মাইলেন, ইহা পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার দুইটি শালগাছের মাঝখানে গালে হাত দিয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও সূর্য্যের অস্তগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা এই আখ্যায়িকা সাজাইয়াছেন, তাঁহাদের সুবুদ্ধিরচনায় বাহাদুরী খুব আছে।

সূর্য্যদেবের গল্প।

যাঁহারা ভারতবর্ষের যাহা কিছু সবই গ্রীকদিগের কাছ হইতে লওয়া মনে করেন, তাঁহারাও বুদ্ধদেব গ্রীকদিগের কাছ হইতে কিছু লইয়াছেন, একথা বলিতে পারেন না। কেননা যখন তাঁহার জন্ম হয়, অথবা যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন পর্য্যন্ত গ্রীকজাতি ভারতবর্ষের দিকে কেহ আসেনই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু থাকিতে পারে, একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব ও মার আর কেহই নহে, জোরোয়াষ্টারের মতের অহুরমজদা ও আহরিমান মাত্র। জোরোয়াষ্টারের মতে যেমন ভাল ও মন্দের লড়াইয়ে শেষ ভালরই জয় হইল, মন্দ হারিয়া গেল, এমতেও তেমনি বুদ্ধ জিতিলেন ও মার হারিয়া গেলেন। জিহোবা ও সয়তান যদি ভাল ও মন্দের লড়াই হয়, তবে বুদ্ধ ও মার না হইবেন কেন?

জোরোয়াষ্টারের গল্প।

যেখানে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এখন সেইখানে থাড়ু নামে এক জাতি বাস করে। উহারা বিশেষ সভ্য নহে। পূর্ব্বে উহাদিগকে চেরো বলিত এখন থেড়ো হইয়া গিয়াছে। ছোটনাগপুরের অনেক অসভ্যজাতিই বলে যে তাহারা চেরোদের সন্তান, রোটাসগড়ের দিক হইতে অথবা তাহারও উত্তর হইতে তাহারা ছোটনাগপুরে আসিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গ বগধ ও চের নামে তিন জাতি আর্য্যদিগের শত্রু ছিল। উহাদের মধ্যে

থাড়ুজাতির ধর্ম্ম।

চেররাই এখনকার থেড়ো, উহাদের ধর্ম্মই বুদ্ধদেব সংস্কার করিয়া উত্তর ভারতের অনেক সুসভ্য দেশে প্রচার করেন। এও একটা মত আছে।

এই সকল মতের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তাহা দেখান আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এবিষয়ে বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে হইবে বুদ্ধদেব আর্য্য কি না। তিনি সে আর্য্য নন একথা বলিবে কিরূপে? তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মান। ইক্ষ্বাকুবংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। তাঁহারও গোত্র আছে, গোতম গোত্রের কপিলমুনি শাক্যবংশের আদিগুরু। গোতমের নাম হইতেই শাক্যসিংহকে গৌতম বলিয়া ডাকা হয়। তখন গুরুর গোত্র লইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর্য্যজাতির গোত্র হইত, প্রমাণ অশ্বঘোষের উক্তি:—

বুদ্ধদেব আর্য্য কি না।

একপিত্রোর্যথাভ্রাত্রোঃ পৃথক্ গুরুপরিগ্রহাৎ
রাম এবাভবৎ গার্গো বাসুভদ্রোপি গৌতমঃ॥

এক বাপের দুই ছেলে; রাম ও বাসুভদ্র। পৃথক্ পৃথক্ গুরু স্বীকার করায় রাম হইলেন গার্গ্য এবং বাসুভদ্র হইলেন গৌতম। সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ অন্য জাতীয় লোক হইয়া গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া গৌতম হওয়া বিচিত্র নহে। শাক্যগণ ইক্ষ্বাকু বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। কিন্তু এটা ত ঠিক তাঁহাদিগকে ইক্ষ্বাকুরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বৈমাত্র ভাইয়ের উপকারের জন্যই তাড়ান হয়। পাটরাণীর ছেলেকে ত তাড়ান শক্ত, সুতরাং তাঁহারা অন্য রাণীর ছেলেই হইবেন। রাজারা তখন অনেক বিবাহ করিতেন এবং বিবাহে জাতিবিচার বড় একটা করিতেন না। সুতরাং ভরতবংশ যেমন পাকা আর্য্য, শাক্য যে তেমন পাকা এরূপ বোধ হয় না। আর্য্যাবর্ত্তও সে সময়ে যে উভয় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাও বোধ হয় না। আর্য্য ও বঙ্গবগধ জাতির সন্ধিস্থলে শাক্যবংশীয় রাজধানী ছিল। এইরূপ নানা কারণে শাক্যেরা যে পাকা আর্য্য ছিলেন, সে বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ হয়।

তারপর যাগযজ্ঞে পশুহিংসা দেখিয়া বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্ম্মের উদ্রেক হয়, এটা ত বুদ্ধের কোনও জীবন-চরিতে বলে না। ললিত-বিস্তার বলে না,

মহাবস্তু-অবদানে বলে না, বুদ্ধচরিতে বলে না। পালি গ্রন্থেও বলে না। তবে সেটার উপর বিশেষ ভরও দেওয়া যায় না। ঐটাই যদি প্রধান কারণ হইত, তাহা হইলে তাঁহার এত জীবনী, একখানি না একখানিতে একথাটা থাকিত যে বুদ্ধ পশুহত্যা দেখিলেন, তিনি করুণায় গলিয়া গেলেন ও যাহাতে পশুহত্যা নিবারণ হয়, তাহারই জন্য ধর্ম্ম-প্রচার করিতে বসিলেন। অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম, তাঁহার পূর্ব্বেও লোকে জানিত। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পঁহুছিতেন ও ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা ত হিংসা করিতেন না। জৈনেরা বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্ব হইতে অহিংসাধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছিল। অতএব ওকথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের উৎপত্তি, একথা স্বীকার করা কঠিন। কারণ উপনিষদ্, বিশেষ তাহার অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধদেবের সময়ে হইয়াছিল কি? ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা হয়। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি, যথা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ব্রাহ্মণের অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত। যাজ্ঞিকেরা এখনও উহা যজ্ঞের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। শঙ্করাচার্য্যের মত ব্যাখ্যা তাঁহারা করেন না। সেকালে যে কোন সার কথা গুরুর কাছ হইতে শিখিতে হইত, তাহারই নাম উপনিষদ্ ছিল। অর্থশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল, কামশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল। বৌদ্ধেরাও উপনিষদ শব্দ বেশ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

মোক্ষস্যোপনিষৎ সৌম্য বৈরাগ্যমিতিগৃহ্যতাম্।
বৈরাগ্যস্যাপি সংবেগঃ সংবিদো জ্ঞানদর্শনম্॥
জ্ঞানস্যোপনিষচ্চৈব সমাধিরুপধার্য্যতাম্।
সমাধেরপ্যুপনিষৎ সুখং শরীরমানসম্॥
প্রশ্রব্ধিঃ কায়মনসোঃ সুখোস্যোপনিষৎ পরা।
প্রশ্রব্ধেরপ্যুপনিষৎ প্রীতিরপ্যবগম্যতাম্॥
তথা প্রীতেরুপনিষৎ প্রামোদ্যং পরমং মতম্।
প্রামোদ্যস্যাপ্যহৃল্লেখঃ কুকৃতেষ্বকৃতেষু চ॥
অবিলেখস্য মনসঃ শীলন্তূপানিষচ্ছুচি।

মোক্ষের মূল বৈরাগ্য; বৈরাগ্যের মূল আগ্রহ; আগ্রহের মূল জ্ঞান-

দর্শন; জ্ঞানের মূল সমাধি; সমাধির মূল শরীর ও মনের সুখ; সুখের মূল শরীর ও মনের শান্তি; শান্তির মূল প্রীতি; প্রীতির মূল স্ফূর্ত্তি; স্ফূর্ত্তির মূল কুকার্য্য করিয়া অথবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া হৃদয়ে ব্যথা না থাকা। ব্যথা না থাকার মূল বিশুদ্ধ শীল।

আর উপনিষৎ বলিয়া একটি দর্শনের মত আমরা সর্ব্বপ্রথম হর্ষচরিতে দেখিতে পাই। হর্ষচরিতে হর্ষ যখন দিবাকরের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় নানা সম্প্রদায়ের ছাত্র পাঠ করিতেছে দেখিতে পাইলেন; তাহার এক সম্প্রদায় ঔপনিষদ। কালিদাসও তাঁহার বিক্রমোর্ব্বশীতে বলিয়াছেন, "বেদান্তষ্ যমাহুরেক পুরুষম্"—এখানেও বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষৎ। সুতরাং কালিদাস ও হর্ষরাজার সময়েই উপনিষদ্ একটা দার্শনিক মতের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে ত বুদ্ধের বহুকাল পরে। উপনিষদের যে এত প্রাদুর্ভাব এখন দেখা যাইতেছে, ইহা ত শঙ্করাচার্য্যের পর হইতেই হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম; উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আরও কথা, বৌদ্ধ-ধর্ম্মটাই কি গোড়ায় অদ্বৈতবাদ ছিল? সেটা মহাযানীরাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে?

শকজাতি হইতে শাক্যজাতির উদ্ভব, এ কথাটাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ শকেরা ত শুঙ্গরাজাদের সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতে ভারতবর্ষে আসে। তাহাও আবার সুদূর পশ্চিমে পাঞ্জাবের কোলে। হিমালয় অতিক্রম করিয়া শকেদের আসা কোথাও দেখা যায় না। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসই নাই, তবে কোন কথা শুনা যায় নাই বলিয়া তাহা একেবারে মিথ্যা, এরূপ জোর করিয়া বলা যাইবে কিরূপে? কিন্তু আমরা শাক্য শব্দের আর এক প্রকার ব্যুৎপত্তি পাইয়াছি। তাহাতে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, শাক নামে একরকম গাছ আছে। সেই গাছে ঘেরা জায়গায় বাস করেন বলিয়া বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষদের শাক্য বলিত। এ কথাটা বেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নেপালের তরায়ে এখনও শকিয়া শালের গাছই অধিক। শাক

গাছ শকিয়া শাল হইলে, শাক্য শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য হিমালয় ও তিব্বত পার হইয়া শকজাতির দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘোষ এক প্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু আডার কলম ও উদ্রক দু'জনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। দু'জনেই বলিয়াছিলেন, 'কেবল' অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারিলেই মুক্তি হয়। বুদ্ধ তাঁহাদের মত না মানিয়া বলিয়াছিলেন, "কেবল" হইলেও অস্তিত্ব ত রহিল ; অস্তিত্ব রহিলে নিঃসম্পর্ক হইবার জো নাই। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যদি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে ত উহা আর্য্য-ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইল। আমার সেই কথাতেই সন্দেহ। সাংখ্যমত কি বৈদিক আর্য্যগণের মত ? শঙ্করাচার্য্য ত উহাকে বৌদ্ধাদি মতের ন্যায় অবৈদিক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এত যত্ন করিয়া ও মত খণ্ডন করেন কেন ? মন্বাদিভিঃ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতত্বাৎ। মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্ট উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া। সাংখ্যমত কপিলের মত চিরকাল প্রবাদ। কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গবগধচেরদিগের দেশে। গঙ্গাসাগর যাইতে কপিলআশ্রম আছে, কবতক্ষের ধারে কপিল মুনির গ্রাম। কপিলবাস্তুও কপিল মুনির বাস্তু। কারণ অশ্বঘোষ বলিতেছেন, গোতমঃ কপিলো নাম মুনির্ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। তাঁহারই বাস্তুতে কপিলবাস্তু নগর। বাস্তবিকও কপিলকে কেহ ঋষি বলে না। তাঁহার নাম করিতে গেলেই বলে আদিবিদ্বান্। বাল্মীকি যেমন আদি কবি, তিনিও তেমনি আদি বিদ্বান্। শ্বেতাশ্বতরে তাঁহাকে "পরমর্ষি" বলা হইয়াছে কিন্তু ভাব ভাষা ও মত দেখিলে এখানিকে নিতান্ত অল্পদিনের পুস্তক বলিয়া বোধ হয়।

কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত ; কৌটিল্য ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। তাঁহার সময় অন্য দর্শন হয় নাই, হইলে তাঁহার মত সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের তাহা অবিদিত থাকিত না। সেই তিনটির মধ্যে লোকায়ত মত, লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ঐ নাম পাইয়াছে, উহার আদি নাই, ও মত

সর্ব্বত্র সকলেরই মত। থাও দাও সুখে থাক—এমত আবার কে প্রচার করিতে যাইবে? সকলেই জানে, সকলেই বুঝে ও সকলেই সেই মতে কার্য্য করে সুতরাং উহার কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। যোগমত সাংখ্যদর্শনেরই রূপান্তর মাত্র। দুইই দ্বৈতবাদী।

সাংখ্য ও যোগের যে সকল পুস্তক আছে সকলগুলিই নূতন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই তাহাদের মধ্যে পুরাণ। ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃষ্টীয় পাঁচ শতের লোক। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেও সাংখ্যমতের পুস্তক ছিল; মাঠর ভাষ্যের কথা অনেক জায়গায় শুনিতে পাওয়া যায়। পঞ্চশিখের দু'চারিটি বচন যোগভাষ্যকার ধরিয়াছেন। আসুরির একটি কবিতা একজন জৈনটীকাকার তুলিয়াছেন। মহাভারতে আসুরির নাম নাই, পঞ্চশিখের নাম আছে। তিনি জনক রাজার সভায় মিথিলায় উপস্থিত ছিলেন। কপিলের নিজের কোন বচন এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যে ২২টি সূত্র কপিলসূত্র বলিয়া চলিতেছে, তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা দেখিয়া লেখা বোধ হয়। কিন্তু অশ্বঘোষের লেখা ও কৌটিল্যের উক্তি দেখিয়া সাংখ্য যে খুব প্রাচীন তাহা বেশ অনুভব হয়।

সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে আদিবিদ্বান্ কপিলের নামও নাই গন্ধও নাই। আমাদের এখনকার ব্যবহারেও সাংখ্যমতের বড় বড় লোকগুলি মানুষ। ঋষিও নন মুনিও নন। আমরা যে নিত্যতর্পণ করিয়া থাকি তাহাতে—

> সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
> কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।

বলিয়া যাহাদের তর্পণ করি, রঘুনন্দন বলেন তাঁহারা মনুষ্য। এই কবিতায় যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহারা সকলেই সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য।

উপরের লেখা হইতে তিনটি কথা বুঝা যায়, যে সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরাণ, উহা মানুষের করা এবং পূর্ব্ব দেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্য্যদের মত নহে, বঙ্গ বগধ বা চেরজাতির কোন আদিবিদ্বানের মত। যাঁহারা পুত্র পশু প্রভৃতি লাভের জন্য, পুষ্টি তুষ্টির জন্য বড় জোর স্বর্গ-

কামনায়, যাগযজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিতাপনাশের জন্য "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নির্লেপ নির্ব্বিকার" ইত্যাদি মত উদ্ভব হওয়া কঠিন। ইহা অনায়াসেই মনে হইতে পারে যে এই মত অন্যত্র উদ্ভুত হইয়া ক্রমে কোন কোন আর্য্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় আর্য্যগণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। হেমাদ্রি বেশীদিনের লোক নহেন, তাঁহার সময় তের শতে, তিনি বলিতেছেন যে, যে ব্রাহ্মণ সাংখ্য মত ভাল জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় পংক্তি-পাবন, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ কাপিল সে পংক্তিবাহ্য। ইহাতেও অনুমান হয়, কপিলের কোন কোন সম্প্রদায়ের মত ব্রাহ্মণগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কোন কোন সম্প্রদায়ের মত একেবারেই গ্রহণ করেন নাই।

যদি সাংখ্য হইতেই বুদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যমত হইতে উহার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে আরও অনেক জিনিস আছে যাহা আর্য্যধর্ম্মের খুব বিরোধী। আর্য্যগণ তিন আশ্রম পালন না করিয়া ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। আপস্তম্ব প্রভৃতি সকল সূত্রকারেরই মত এই যে, ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ, তাহার পর বানপ্রস্থ ও তাহার পর ভিক্ষু হইবে। কিন্তু বুদ্ধ উপদেশ দিতেন যে যখনই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে। এমন কি অতি শিশুকেও ভিক্ষু করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কয়েকটি নাবালগকে ভিক্ষু করায় কপিলবাস্তুতে বড় গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে বুদ্ধদেবের পিতা বুদ্ধকে বুঝাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, নাবালগকে শিষ্য করিতে হইলে তাহার পিতামাতার অনুমতি লইতে হইবে। ক্রমে বৌদ্ধ কর্ম্মবাচায় দেখিতে পাওয়া যায়, একুশ বৎসরের পূর্ব্বে কাহাকেও দীক্ষা দেওয়া হইত না। যে কেহ দীক্ষা লইতে আসিত, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইত, তোমার বয়স একুশ বৎসর হইয়াছে ত? বহুকাল পরে শঙ্করাচার্য্য এই মত প্রকাশ করেন যে, 'যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। এটি জাবালোপনিষদের বচন। সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেই এই উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। উহা কোন ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত নহে, সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে।

আশ্রম পালন

বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ হইতেও দেখা যায় উহা আর্য্যবিরোধী বেশ। আর্য্যগণ উষ্ণীষ ও উপানহ্ ভিন্ন চলিতেন না। মাথায় পাগড়ী ও পায়ে জুতা সবারই থাকিত। কিন্তু বৌদ্ধগণ বাঙ্গালীর মত খালি-মাথায় থাকিতেন এবং উপানহ ব্যবহার করিতেন না।

বেশ

এই সকল নানা কারণে বোধ হয় যে, পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্গ বগধ ও চের নামে যে তিনটি সভ্য জাতি বাস করিতেন, তাহাদের সঙ্গে আর্য্যগণের মেলামেশায় বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। যে জায়গায় আর্য্যগণের পশ্চিমসীমা ও ঐ জাতিসকলের পূর্ব্বসীমা, সেইখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। উহা পূর্ব্বাঞ্চলে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, পশ্চিমাঞ্চলে উহার প্রাদুর্ভাব কখনই এত অধিক হয় নাই। পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র ও মৎস্যদেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, ইহার প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না।

কোথা হইতে আসিল? (২)

ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ বগধ ও চের জাতি।

পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। বঙ্গবগধচের জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম লইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি ঠিক হউক আর নাই হউক, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মতামত আচারব্যবহার অনেকটা পূর্ব্বদিক হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে বঙ্গবগধচের জাতির কথা অল্প লোকেই জানে। অতি অল্পদিন হইল ঐতরেয় আরণ্যকের একটি ব্রাহ্মণে উহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে। এখনও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন ওখানটার অর্থবোধই হয় না। সায়ন বঙ্গবগধচের শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তবে ওকথার উপর জোর দেওয়া যায় কি? সায়নের কথা ধরি না; সায়ন বেদরচনার দুই তিন হাজার বৎসর পরে উহার অর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। দু'চারটা মানুষের নাম ও দেশের নামের তিনি যে অন্য অর্থ করিয়া দিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এস্থলে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা নিজেও ইহার অর্থ কি স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে বেশ দেখিতে পাইতেছি যে বঙ্গশব্দের মানেতে কোনও গোল নাই। সায়নের অর্থ বনংগতা, এ অর্থ আমরা লইতে পারি না। বগধ যে মগধ তাহাতেও আমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। তামিল জাতির একটা শাখাকে যে চের বলিত তাহারও সন্দেহ নাই। এখনও দক্ষিণ দেশে তামিল বা দ্রাবিড়িয় জাতির মধ্যে কেরল নামে একটি প্রবল জাতি আছে। কেরলদিগের প্রাচীন নাম চের। চেরো বলিয়া একটি জাতিকে ছোটনাগপুরের সমস্ত জাতিই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। কপিলবাস্তুর নিকটে এখনও যে থাড়ু জাতি আছে তাহারাও চেরো বা চেরজাতির একটা ধারা।

এই সকলের সঙ্গে যদি আর একটা কথা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা

হইলে আরও একটু সুবিধা হয়। সকলেই জানেন যে আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণগুলিরই শেষ অংশ। ব্রাহ্মণ যে প্রকারের বই, আরণ্যকও সেই প্রকারেরই বই। ব্রাহ্মণে যাহা বলা হয় নাই, আরণ্যকে তাহাই বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ অংশে ইন্দ্রদেবতার মন্ত্রে অভিষেক হওয়ায় যে-সকল রাজা বড় হইয়াছিলেন, বিশেষ অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে, যে ঋষি অভিষেকের পুরোহিত ছিলেন তাঁহার প্রশংসা আছে, আর যে রাজা অভিষেক লইয়াছিলেন তিনি কতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। এই তালিকার শেষ ভাগে লেখা আছে যে ভরত-রাজা ইন্দ্র অভিষেক লইয়া ১৩৩টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৭৮টা যমুনার পশ্চিমে মরুষ্ণ দেশে, আর ৫৫টা গঙ্গার পূর্ব্বে জলবৃষ্টির দেশে। যমুনার পশ্চিমে যতদূর যাইবে মরুদেশ আর উষ্ণ দেশ। কতদূর ভরতের অধিকার ছিল বলা যায় না। ৭৮ অশ্বমেধের জন্য কতখানি দেশ লওয়া আবশ্যক জানি না। তবে এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বেলুচিস্তান উহার মধ্যে ছিল না। থাকিলে ভরতের নাম অনুসারে উহাও ভারতবর্ষ বলিয়া গণ্য হইত; তবেই যমুনার পশ্চিম হইতে সিন্ধুদেশের পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়া তিনি ৭৮টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। তাই যদি হইল তবে ৫৫টা অশ্বমেধের জন্য গঙ্গার পূর্ব্বে কতটা জমি তাহাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল? ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্তর্বেদীর নাম একেবারেই করে না, বলে যমুনার পশ্চিমে ও গঙ্গার পূর্ব্বে। এখন ৫৫ অশ্বমেধের জন্য কতটা দেশের দরকার। আমার বোধ হয় এলাহাবাদ হইতে ঠিক উত্তরমুখে রেখা টানিলে ঐ রেখা ও গঙ্গার পূর্ব্বপারের মধ্যে যত দেশ পড়ে তাহাই ৫৫টা অশ্বমেধের পক্ষে যথেষ্ট।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভরতের রাজত্ব।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভারতবর্ষ অথবা আর্য্যভূমির অথবা আর্য্য জাতির বসতি বিস্তারের এই সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে, তাহার পরই ঐতরেয় আরণ্যক বলিলেন যে বঙ্গ বগধ চেরজাতি পক্ষিবিশেষ; উহাদের ধর্ম্ম নাই, উহারা নরকগামী হইবে। ইহার মোটামোটি অর্থ এই হইল যে আর্য্যগণ এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার

বঙ্গবগধ ও চেরগণ পাখী।

ওদিকেই বঙ্গবগধচেরজাতি। ইহারা আর্য্যগণের শত্রু। আর্য্যগণের বসতি-বিস্তারে বাধা দিতেন তাই আর্য্যগণ ইহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। যাহাদিগকে তাহারা দেখিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পশু পক্ষী রাক্ষস বলা তাঁহাদের রোগ ছিল। তামিলগণ তাহাদের কাছে বানর। কর্ণাটগণ হয়ত ভালুক, লঙ্কার লোক রাক্ষস। সেইরূপ বাঙ্গালার লোক পাখী।

বুদ্ধ পূর্ব্বাঞ্চলের লোক।

বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পাখীর দেশেই জন্মান। তাঁহারও পূর্ব্বে কনকমুনি কপিলবাস্তুরই নিকটে জন্মাইয়া বোধি লাভ করেন। এই অঞ্চলেই জৈনধর্ম্ম প্রচারক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বৈশালী, পাটনার উত্তর-পশ্চিম গঙ্গার উত্তরপারে। ইনি আবার জৈনযতি হইয়া বার বৎসর কাল পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আসেন। বৈশালীর লোক মনে করিল, মহাবীর নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বার বৎসর পরে তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া কেবলী হইয়া ফিরিলেন। তাঁহারও পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগের পর পূর্ব্ব অঞ্চলে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া সমেতগিরি অর্থাৎ পরেশনাথ পাহাড়ে বাস করিয়া তথায়ই দেহরক্ষা করেন। আর আর তীর্থঙ্করদের অনেকেই পূর্ব্ব অঞ্চলের লোক। ২৪জন বুদ্ধ ও ২৫জন তীর্থঙ্করের বৃত্তান্ত পড়িলে একথা আরও প্রমাণ বলিয়া বোধ হইবে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ভেদ।

পশ্চিমাঞ্চলে যখন আর্য্যগণ যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত, দেশ দখল করিতে ব্যস্ত, শ্রৌতসূত্র রচনায় ব্যস্ত, শূদ্রগণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখার বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত, তখন পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্গ-বগধচেরগণ পরকাল লইয়া ব্যস্ত, কিসে জন্মজরামরণের হাত এড়ান যায় তাহাই লইয়া ব্যস্ত। পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ঋষির পর ঋষি শ্রৌতসূত্র রচনা করিতেছিলেন; পূর্ব্ব অঞ্চলে তেমনি তীর্থঙ্করের পর তীর্থঙ্কর, বুদ্ধের পর বুদ্ধ পরকালে কিসে সুখে থাকা যায় তাহারই উপায় দেখিতেছিলেন।

শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ, মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর, দুজনেই এক সময়ের লোক।

দুজনেই খৃষ্টের পূর্ব্বে ছয় শতের লোক। সুতরাং দীপঙ্কর প্রভৃতি ২৪জন বুদ্ধ আর ঋষভদেবাদি ২৪জন তীর্থঙ্কর তাহাদের অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে শাক্যসিংহের পূর্ব্বে যে ২৩জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষ নন—বৌদ্ধেরা আপনাদের ধর্ম্মটা পুরাণ, তাই দেখাইবার জন্যই ২৫টা নাম করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কনকমুনির থাম্বা পাওয়া গিয়াছে, যেখানে তাহার নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহা স্থির হইয়াছে; তাঁহাকে মানুষ নয় বলা এখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার নেপালী বৌদ্ধেরা বলে চারিযুগে আটজন মানুষ বুদ্ধ। বিপশ্বী ও শিখী সত্যযুগে, কাশ্যপ ও বিশ্বভূ ত্রেতাযুগে, ক্রকুচ্ছন্দ ও কনকমুনি দ্বাপরে, এবং শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয় কলিযুগে। অপর ১৭ জনকে তাঁহারা মানুষ বলুন আর নাই বলুন, শাক্যমুনি ও তাঁহার পূর্ব্বেকার ছয়জনকে তাহারা মানুষ বলেন। তীর্থঙ্করদের মধ্যেও, অনেকে মনে করেন যে শেষ দুইজন মাত্র সত্যসত্য মানুষ, বাকীগুলি মনগড়া মাত্র। তাহা হইলেও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে পরকাল লইয়া অনেকদিন হইতে নাড়াচাড়া হইতেছিল।

২৪জন বুদ্ধ ও ২৪জন তীর্থঙ্কর।

বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, তাহাদের নাম যথা আজীবক—ইহা গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম্ম, নিগ্রন্থ—ইহা মহাবীরের ধর্ম্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, অজিতকেবশ কম্বল একজন, সঞ্জয় একজন ও পোকুদ কত্যায়ণ একজন।

এগুলিও ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেইখানেই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে লোক যে কেবল ধর্ম্ম লইয়াই থাকিত, এরূপ নহে; এখানে অন্যান্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ডাক্তার হর্নলি বলেন যে অস্ত্রচিকিৎসা পূর্ব্বাঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল। হস্তিশাস্ত্র এই দেশেই রচনা হয়। ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও পূর্ব্বভারতে; সুতরাং পূর্ব্বভারত যে এককালে একটি সুসভ্য দেশ ছিল, ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর্য্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আক্রমণ

পূর্ব্বাঞ্চলেই বহু ধর্ম্মের প্রসার।

করিয়া তাহার রাজ্য সমাজ আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে আর্য্য সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্ব্বসমাজ, পূর্ব্ব-আচার ও পূর্ব্ব-ব্যবহার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই এত ধর্ম্ম হইল, শেষ সব ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধ-ধর্ম্মই পূর্ব্ব ভারতে থাকিয়া পূর্ব্বভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল।

বৌদ্ধদিগের অনেক আচারব্যবহার আর্য্যগণের মধ্যে নাই। বৌদ্ধেরা সব মাথা কামায়—কোথাও এক গাছি কেশ রাখে না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা শিখা রাখা নিতান্ত দরকার। একথা যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, যে সকল মুসলমানেরা প্রথম বেহার দখল করেন তাহাদেরও আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম্ম আছে জানিতেন না। একটা বৌদ্ধ-বিহার জয় করিয়া তাহারা দেখিলেন সেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ রহিয়াছে তাহাদের সব মাথা কামান। সব মাথা কামান হিন্দুর হইতেই পারে না। তবে ইদানীং কোন কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শিখাত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদের ন্যায় অবমাননা আর নাই। সেইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবে। তাহার সম্পত্তি তাহার সঙ্গে দিবে, কেবল তাহার শিখাটি ছেদন করিয়া লইবে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মে সকলেরই শিখাচ্ছেদ করিতেই হইত।

বৌদ্ধ ও আর্য্য আচার ব্যবহার ভেদ।

মাথা কামান।

আহার বৌদ্ধেরা বারটার আগে করিবে। বারটার এক মিনিট পরে আহার করিতে পারিবেন না। আহার তাহাদের কিছুই অখাদ্য নহে। যদি তাহাদের আহারের উদ্দেশে মারা না হয়, অন্য কারণে কোনও জন্তু মারা হয়, তাহারা সে জন্তুর মাংস অনায়াসে খাইতে পারে। রাত্রে তাহারা রস খাইতে পারে, জল খাইতে পারে, কিন্তু শক্ত জিনিস খাইতে পারে না। তাহারা পেয় খাইতে পারে কিন্তু চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য খাইতে পারে না। এইত তাহাদের নিয়ম। এটি কিন্তু

আহারের নিয়ম।

আর্য্য নিয়মের বিরোধী। আর্য্যগণ এক সূর্য্যে দুইবার খাইতেন না। সুতরাং দিনে একবার ও রাত্রে একবার। তাঁহাদের কল্যবর্ত্ত বা প্রাতরাশের কথা আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। একবার খাইয়া আর্য্যগণ চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ক্ষুধা সতেজ ছিল।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সোনা রূপা ছুঁইতে পারিতেন না। পূর্ব্বভারতে উহাদের ছোঁয়ার দরকার ছিল না। কারণ সোনা রূপার টাকা এদেশে অতি কমই ব্যবহার হইত। এদেশে কড়ির ব্যবহার অধিক ছিল, সোনা রূপা ব্যবহার না করিলেও চলিত।

স্বর্ণ রৌপ্য ত্যাগ।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ করিতেন। হিন্দুস্থানে পঞ্জাবে এমন কি ভারতবর্ষের সব দেশেই খাটিয়ার উপর শোয়। মাটিতে শুইতে তাহাদের বড়ই কষ্ট হয়, পারতপক্ষে তাহারা মাটিতে শোয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহার বিপরীত। অধিকাংশ লোকই ভূমিতে শয্যা পাতিয়া শোয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইলে খাট চৌকি তক্তাপোষ ব্যবহার করে।

উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ।

বৌদ্ধমতে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ। গৃহস্থ যাহারা পঞ্চশীল মাত্র গ্রহণ করিবে তাহারাও মদ খাইতে পারিবে না, একথা আর্য্যগণের পক্ষে খাটে না। তাঁহারা সোম পান করিতেন। সৌত্রামণিযাগে তাঁহারা সুরাপান করিতেন। পুরাণে বলে পূর্ব্বে সকলেই সুরাপান করিতেন, কিন্তু শুক্রাচার্য্য শাপ দেওয়ায়, মদ খাওয়া মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু বৈধ মদ্য সকল সময়েই চলিত; যথা পশুযাগে সোম, সৌত্রামণিতে সুরা।

মদ্য ত্যাগ।

এইরূপে দেখা যায় যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও আর্য্য-ধর্ম্মে অনেক কাজের কথায়ই প্রভেদ। তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল বলিতে গেলে, আর্য্য-ধর্ম্ম হইতে আসিল একথা বলা যায় না, আর কোনও দিক হইতে আসিয়াছে। এত প্রাচীনকালে আর কোন্ দিক হইতে আসিবে সুতরাং পূর্ব্বদিক হইতেই আসিয়াছে। আচ্ছা যদি তাহাই হইল, তবে বুদ্ধদেব কি নূতন কথা বাহির করিয়াছেন? তাঁহার ধর্ম্মের স্থূল কথাগুলি, বিষয়গুলি যদি

প্রাচীন ধর্ম্ম বা প্রাচীন সমাজ হইতে লওয়া, তবে তাঁহার নূতনত্ব কি? বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও লোকে সংসার ত্যাগ করিত, ভিক্ষু হইত; যেমন পার্শ্বনাথের দল, কনকমুনির দল। সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া থাকিতে গেলেই অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি শীল গ্রহণ করিতে হয়, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রাচীন ভিক্ষুরাও তাহাই করিত। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও সঙ্ঘারামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের। ভিক্ষুদিগের শাসনের জন্য যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের। এক জায়গায় অনেক ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। এইরূপ অনেকগুলি ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ গোলযোগ যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। যে সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া তিনি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, সেগুলি প্রাচীন ভারতে চলিত থাকিলেও যে আকারে তাহাদিগকে এখন দেখিতে পাওয়া যায় সে আকারটি তাঁহার দেওয়া। তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সবশিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ, দশজনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালান, তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসঙ্ঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার সঙ্ঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যাবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম্ম এত বড়, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, যাহার জন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ 'মাঝামাঝি চল, বাড়াবাড়ি করিও না।' তিনি নৈরঞ্জনার ধারে ছয় বৎসর তপস্যা করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, যাহা পাইয়া তিনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করেন, যে জ্ঞান পাওয়ায় ইন্দ্র ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, যাহা পাওয়ায় মার একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, সে এই মধ্যমা

প্রতিপৎ। মাঝামাঝি চল। অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়া চল যেন কোন কীট মুখে না ঢুকিতে পারে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে তাহাতে কীট পতঙ্গ পড়ে। মলত্যাগ করিয়া তাহা কাঠি দিয়া নাড়িয়া দিও যেন পোকামাকড় তাহার মধ্যে লুকাইয়া না যায়। রাস্তায় চলিবার সময় এক গাছ ঝাঁটা হাতে করিয়া যাইও যেন তোমার পায়ের চাপনে কোন পোকা মাকড় মারা না যায়। এসকল বাড়াবাড়ি নয় কি? বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া কোন জীবহত্যা করিও না। তাহা হইলেই অহিংসা ধর্ম্ম পালন হইবে। তিনি বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভাল নয়; কেবল ভাল খাব, ভাল পরব, তারি চেষ্টা করা, সেটা ভাল নয়, আবার ক্রমাগত উপবাস করিব, পঞ্চতপা করিব, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিব, ইহাও ভাল নয়। তিনি নিজে যথেষ্ট কঠোর ব্রত করিয়াছিলেন, যথেষ্ট উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলেন যে উহাতে কোনও লাভ নাই, শরীরের কষ্টই সার; তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে এগুলা করা ভাল নয়। ভোগও করিবে না, কঠোরও করিবে না, তবে করিবে কি? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন,—আহারঃ প্রাণযাত্রায়ৈ ন ভোগায় নদৃপ্তয়ে। এই যে মধ্যমা প্রতিপৎ এইটিই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা, উপনিষৎ। বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব্ব বিষয়ে মধ্যমা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষ্যদিগকে শিখাইতেন। দুটা বিরোধী জিনিস উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

হীনযান ও মহাযান

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ কি? হীনযান কাহাকে বলে, মহাযানই বা কাহাকে বলে? কেনই বা হীনযানকে 'হীন' বলে, আর মহাযানকে 'মহা' বলে? আগে যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে অনেক জায়গায়ই এই তফাৎ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার যতদূর পারি পরিষ্কার করিয়া সেই তফাৎই দেখাইব।

হীনযান বলিয়া কোন যান নাই। মহাযানেরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলিত। যেহেতু তাহারা 'মহা', সুতরাং তাহাদের আগেকার যাহারা, তাহারা 'হীন' অর্থাৎ ছোট। আগে কিন্তু দুটি যান ছিল,— (১) প্রত্যেকবুদ্ধযান বা প্রত্যেকযান আর (২) শ্রাবকযান। বুদ্ধদেবও প্রত্যেকবুদ্ধযান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যখন পৃথিবীতে কোন বুদ্ধ উপস্থিত নাই, তাঁহার মুখ হইতে ধর্ম্মকথা শুনিবার কোন সুবিধা নাই, তখনও লোকে আপনার চেষ্টায় আপনার যত্নে ও আপনার উদ্যমে জন্মজরামরণাদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। হিন্দুদের ঋষিরা এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এইরূপে যাহারা নিজের যত্নে, বুদ্ধের সাহায্য না পাইয়া, উদ্ধার হয়, তাহাদিগকে প্রত্যেকবুদ্ধ বলে; তাহাদের যে যান তাহার নাম প্রত্যেকবুদ্ধযান। এই প্রত্যেকবুদ্ধেরা আপনিই উদ্ধার হইতে পারে, আর কাহাকেও উদ্ধার করিবার শক্তি ইহাদের নাই।

বুদ্ধের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া যাহারা ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের নাম 'শ্রাবক'। বুদ্ধের পরামর্শ লইয়া অনেক শ্রাবক উদ্ধার হইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে 'শ্রাবক' হন, তাহার পর 'ভিক্ষু' হন, বিহারে বাস করেন। অনেকদিন বিহারে থাকিতে থাকিতে 'স্রোতাপন্ন' হন, 'সকৃতাগামী' হন, 'অনাগামী' হন, পরে 'অর্হৎ' হইয়া যান। ইঁহারাও জন্মজরামরণাদি হইতে অব্যাহতি পান, কিন্তু ইঁহারাও কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারেন না। ইঁহাদের যে যান, তাহার নাম 'শ্রাবকযান' বুদ্ধ নির্ব্বাণ পাইলে

তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে যাঁহারা ধর্ম্মকথা শোনেন, তাঁহারা পর পর জন্মে ধার্ম্মিক বৌদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আবার না যতদিন বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব হয়, ততদিন তাঁহাদের মুক্তি পাইবার উপায় নাই। এমনও অনেক জায়গায় শোনা যায় যে, একজন বুদ্ধের শ্রাবক অনেক জন্মের পর আর একজন বুদ্ধের কাছে উদ্ধার হইলেন।

মহাযানের লোকেরা বলিত 'প্রত্যেক' ও 'শ্রাবক' এই দুই যানই হীন, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর। আপনার উদ্ধার হইলেই হইল, ইহারা জগতের কথা ভাবে না, ইহাদের কাছে যেন জগৎ নাই, তাই মহাযানেরা ইহাদিগকে 'হীন' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। আপনাদিগকে মহাযান বলে, যেহেতু তাহারা আপনার উদ্ধারের জন্য তত ভাবে না, জগৎ উদ্ধারই তাহাদের মহাব্রত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'অব-লোকিতেশ্বর' উদ্ধার হন হন,—মহাশূন্যে বিলীন হন হন, এমন সময়ে জগতের সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে? তাই শুনিয়া 'অবলোকিতেশ্বর' প্রতিজ্ঞা করিলেন, একটিও প্রাণী যতক্ষণ বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণে প্রবেশ করিব না। এই যে করুণা, সর্ব্বভূতে দয়া, ইহাই মহাযানকে 'মহা' করিয়া তুলিয়াছে, আর ইহারই তুলনায় অপর দুই যানই হীন হইয়া গিয়াছে।

হীনযান অর্হত্ব পাইলেই খুসী, মহাযান তাহাতে খুসী নয়,—তাহারা বুদ্ধত্ব চায়। এ দুয়ে তফাৎ কি? অর্হৎও নির্ব্বাণ পাইলেন, বুদ্ধও নির্ব্বাণ পাইলেন। উভয়েই জন্মজরামরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। উভয়েরই বোধিজ্ঞান লাভ হইল। তবে ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? অর্হতেরা হীনযান হইলেন, আর বুদ্ধ মহাযান হইলেন কেন? বুদ্ধ যখন বোধগয়ায় অশ্বত্থগাছের তলায় সম্যক সম্বোধি লাভ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, সেই সময় ব্রহ্মা ও ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এখন নির্ব্বাণ লাভ করিলে মগধের গতি কি হইবে? মগধ যে অধর্ম্মের ভারে ডুবিতে বসিয়াছে। তাঁহাদের কথায় বুদ্ধ স্বীকার করিলেন যে তিনি মগধের উদ্ধারের জন্য বহুকাল বাঁচিয়া

থাকিবেন। তাই তিনি কাহারও মতে পঁয়তাল্লিশ, কাহারও মতে একচল্লিশ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করেন ও আশী বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি পরের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন—তাই তিনি 'বুদ্ধ', আর তাঁহার শিষ্যেরা নিজেরাই উদ্ধার হইতেন—তাই তাঁহারা 'অর্হৎ'।

যখন মহাযান প্রচার হইতে লাগিল, তখন শ্রাবকযানেরা বলিল, একি? বুদ্ধ ত এধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, এরূপ ব্যাখ্যাও তিনি করেন নাই। পালিতে তাঁহার যে সকল উপদেশ আছে, তাহাতেও ত এসকল কথা বলে না। এ একটা নূতন প্রচার হইতেছে, ইহা বুদ্ধের মত নহে। তখন মহাযানেরা বলিল, বুদ্ধ ঠিকই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তোমরা বুঝ নাই। বুদ্ধদেব নিজে কি করিয়াছিলেন? তিনি ত মগধের উদ্ধারের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তোমরা ত তাহা কর নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝ নাই। তোমরা বুদ্ধের অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার কথার সোজাসুজি মানে করিয়া লইয়াছ, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই। তাই তিনি পরের উদ্ধারের জন্য যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোমরা আপনার উদ্ধারের পথ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছ। ইহাতে শ্রাবকযান উত্তর করিল, বা! তা কি কখনও হয়,—'পরার্থে' কি উপদেশ হয়? উপদেশটা "স্বার্থে"ই হয়, সেটা 'পরার্থে' গিয়াই দাঁড়ায়। আমি তোমার উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিলাম, তুমি উদ্ধার হইলে। আমার এ উপদেশটা কি 'স্বার্থে' উপদেশ হইল? আমি ত তোমায় উদ্ধার করিয়া দিলাম, 'পরার্থে'ই উপদেশ দিলাম। এইরূপে রামের 'স্বার্থ', হরির 'স্বার্থ', শ্যামের 'স্বার্থ', হইতে হইতে সেই 'স্বার্থ'ই ত 'পরার্থ' হইয়া দাঁড়াইল। তবে তুমি আর 'পরার্থ' 'পরার্থ' বলিয়া একটা কি জাঁক করিতেছ? মহাযান বলিলেন, আমরা উহাকে 'পরার্থ' বলিতেছি না। তোমার উপদেশ যদি তোমার শিষ্যের স্বার্থের জন্যই হয়, সেটা 'স্বার্থোপদেশই' হইল। তুমি ত আর তোমার শিষ্যকে পরের উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিতেছ না? তুমি সকলকেই উপদেশ দিতেছ, বাপু আপনার আপনার পথ দেখ। তুমি ত আর

তাহাকে বলিয়া দিতেছ না, বাপু জগৎ উদ্ধার কর। তুমি সম্বোধি পাইলে বটে, কিন্তু 'অনুত্তরসম্বোধি' তুমি কি করিবা পাইলে? যাহার চেয়ে আর বড় সম্বোধি নাই, সেই সর্ব্বোচ্চ সম্বোধি তুমি পাইলে কই?

আর এক কথা;—তুমি ত বাপু আপনার লইয়াই ব্যস্ত; তোমার শিষ্যেরাও আপনার লইয়া ব্যস্ত; তাহার শিষ্যেরাও আপন লইয়াই ব্যস্ত। তোমরা ত সকলেই অর্হৎ হইতে চলিলে, তোমাদের ভিতর বুদ্ধ হইবে কে? তোমাদের শ্রাবকযান ত কিছুতেই বুদ্ধ হইবার উপায় হইতে পারে না। কারণ তোমরা চাহ অর্হৎ হইতে; তোমরা বুদ্ধ হইবার উপায় জান না; তোমরা দুগ্ধ খাইতে চাও কিন্তু গরুর বাঁট চেন না। শুনিয়াছ গরু দুইলে দুধ হয়, তাই শিং ধরিয়া টানিতেছ,—তাহাতে দুধ পাইবে কিরূপে? তোমরা 'স্বার্থোপদেশ' দিতেছ, তোমরা 'পরার্থোপদেশ' জান না,—কেমন করিয়া বুদ্ধ হইবে? তোমরা মহাযানের মর্ম্ম জান না, তোমরা হীনযানই থাকিবে।

তোমরা অর্হৎ হইতে চাও, 'বোধিসত্ত্ব' কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান না। তোমরা জান বুদ্ধ এককালে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, আর মৈত্রেয় একজন বোধিসত্ত্ব আছেন, তিনি একদিন বুদ্ধ হইবেন। তোমরা বোধিসত্ত্ব হইতে চাও না। বোধিসত্ত্ব হইতে গেলে, তাহাকে বুদ্ধ কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমরা জান না, পড় না, হয় ত কেয়ারও কর না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব হইবার উপদেশও ত বুদ্ধদেব দিয়া গিয়াছেন। কারণ বোধিসত্ত্ব না হইলে ত একেবারে বুদ্ধ হইবার যো নাই। একথা ত তিনিও বলিয়া গিয়াছেন। সে উপদেশের 'আশয়' অতি উচ্চ; অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ; তাহার উপদেশও অতি উচ্চ; তাহার জন্য শিক্ষা অতি উচ্চ; তাহার জন্য সাধনা অতি উচ্চ; তাহার জন্য যে সকল সামগ্রী আবশ্যক, তাহা অতি দুর্ল্লভ; তাহার জন্য কত জন্ম যে সাধনা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তোমাদের কি? তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প, উপদেশ সহজ, সাধনা সহজ, সামগ্রী অল্প ও সুলভ। আর কালের কথা বলিতে চাও,—তোমরা ত তিন জন্মেই আপনার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পার। এই সকল কারণেই আমরা তোমাদের 'হীন' বলি। এখন

বুঝিয়া দেখ দেখি, তোমরা 'হীন' কি না? আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা কত বড়, আমরা বুদ্ধ হইব; আমাদের উপদেশ কত বড়,—আমরা জগৎ উদ্ধার করিবার উপদেশ দিই; আমাদের সাধনা কত উচ্চ,—আমরা একাই জগৎ উদ্ধার করিব,—এই আমাদের সাধনা; আমাদের সামগ্রী ব্রহ্মাণ্ডময়, আর আমরা যত জন্মই যাউক না,—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলে কিছুতেই বিরত হইব না। দেখ দেখি, আমাদের যান মহাযান কি না? দেখ দেখি, তোমাতে আমাতে কত তফাৎ?

শ্রাবকযান বলিতেছেন;—তোমার বুদ্ধবচনের উপর বড়ই আদর দেখিতেছি, কিন্তু বুদ্ধবচন হইতে গেলে 'সূত্রে' ত থাকা চাই, 'বিনয়ে' ত থাকা চাই, 'অভিধর্ম্মে'ও ত থাকা চাই। এই লইয়াই ত 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটকের বাহিরে ত বুদ্ধবচন নাই। তোমাদের এসব কোথায়? তোমরা ত বলিয়া বেড়াও কোন ধর্ম্মেরই 'সত্তা' নাই,—'স্বভাব' নাই। তোমাদের মতে ত সবই অভাব,—সবই শূন্য। এ সকল বুদ্ধবচন হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে মহাযান বলিতেছেন,—কেন আমাদের ত শত শত সূত্র রহিয়াছে। এক প্রজ্ঞাপারমিতাই ত সকল সূত্রের রাজা, তাহার পর আরও কত সূত্র আছে। বিনয়ের কথা বলিতে চাও,—বোধিসত্ত্বের বিনয়—সে অতি বড়। বিনয়ের উদ্দেশ্য ত ক্লেশনাশ, সমস্ত বিকল্পই ক্লেশ। এই যা কিছু চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি,—সমস্তই 'বিকল্প'। যখন 'পরমার্থ সত্য' জানিতে পারিব, সমস্ত বিকল্প নাশ হইয়া যাইবে। যখন নির্ব্বিকল্প হইয়া যাইব, তখনই আমাদের বিনয়ের চূড়ান্ত হইবে। আমাদের 'বিনয়' ছোটখাট কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে না; আমাদের বিনয়ের উদারতা ও গভীরতা তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। আর অভিধর্ম্মের কথা বলিতেছ,—অভিধর্ম্ম ত ধর্ম্ম লইয়া। আমাদের ধর্ম্ম 'অনুত্তরসম্যক্‌সম্বোধি' প্রাপ্তি। সুতরাং আমাদেরও 'সূত্র'ও আছে, 'বিনয়'ও আছে, 'অভিধর্ম্ম ও আছে।

শ্রাবকযানে সর্ব্বপ্রথম 'ত্রিশরণ'গমন, তাহার পর 'পঞ্চশীল'গ্রহণ। এ দুটি জিনিস গৃহস্থরাও করিত, ভিক্ষুরাও করিত। ইহার পর 'অষ্টশীল'গ্রহণ অর্থাৎ ঐ পাঁচের উপর আরও তিন,—স্রক্‌চন্দনাদি ত্যাগ,

রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ ত্যাগ, গীতবাদিত্রাদি ত্যাগ। অর্থাৎ ফুলের মালা গলায় দিবে না, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য মাখিবে না, মোটামুটি, বিলাসদ্রব্য সব ত্যাগ করিবে। কাহাকেও রূঢ় কথা কহিবে না, কাহাকেও গালাগালি দিবে না, অর্থাৎ জিহ্বা সংযম করিবে এবং গান বাজনা প্রভৃতি করিয়া সময়ক্ষেপ করিবে না। এই যে তিনটি শীল, ইহা খুব উচ্চ ভক্ত গৃহস্থের জন্য। গৃহস্থ ইহার উপর আর যাইতে পারিবে না। ইহার উপর আর দুটি শীল দিলে দশ শীল হয়। সে দুটি উচ্চাসন-মহাসন-ত্যাগ ও কাঞ্চনত্যাগ অর্থাৎ পয়সা কড়ি হাতে করিবে না। এ দুটি শীল শুধু ভিক্ষুদিগের জন্য, গৃহস্থের ইহাতে অধিকার নাই। এ দশ শীল ছাড়া শ্রাবকযানের আর একটা বড় জিনিস 'পোষধ'ব্রত, অর্থাৎ উপোষ করা। দুই অষ্টমীতে, দুই চতুর্দ্দশীতে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার উপোষ করিয়া কেবল ধর্ম্মকথা শুনিবে। সেইদিন গৃহস্থ ও ভিক্ষু সবাই বিহারে আসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে।

মহাযানে আমরা ত্রিশরণগমনের কথা খুব পাই। শীলরক্ষার কথাও পাই। কিন্তু 'পোষধ'ব্রতের কথা বড় একটা পাই না। শীলরক্ষাটা শ্রাবকেরা যত বড় বলিয়া মনে করেন, বোধিসত্ত্বেরা তত বড় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ধর্ম্ম আর এক রূপ; তাঁহারা 'শরণ'-গমনের পরই কিসে বোধিলাভের জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মে, তাহারই চেষ্টা করেন,—ইহারই নাম 'চিত্তোৎপাদ' বা 'বোধিচিত্তোৎপাদ'। 'বোধিচিত্তোৎপাদের' পর আর দুইটি কথা শুনিতে পাই,—'পাপদেশনা' ও 'পুণ্যানুমোদনা' অর্থাৎ পাপ কাহাকে বলে তাহার উপদেশ ও পুণ্যের প্রতি আসক্তি। ইহার পর তাঁদের 'ষট্‌পারমিতা'। পারমিতা শব্দের অর্থ লইয়া বড় গোলযোগ আছে; অনেকে ইহার অর্থ করেন 'পারং ইতা' অর্থাৎ যে পারে গিয়াছে অর্থাৎ যে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় এরূপ ব্যাখ্যা করিলে ব্যাকরণ থাকে না। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' ব্যাকরণদুষ্ট নহে, যেহেতু 'পারমিতা'ও স্ত্রীলিঙ্গ, 'প্রজ্ঞা'ও স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু 'শীলপারমিতা' কি করিয়া হইবে? শীল ক্লীবলিঙ্গ, 'পারমিতা' স্ত্রীলিঙ্গ। শীলপারমিতা শব্দটি ব্যাকরণদুষ্ট হইল। যদি বল

বৌদ্ধপণ্ডিতেরা ব্যাকরণের বন্ধনের মধ্যে যাইতে চাহেন না, তাহা হইলে এ ব্যাখ্যা চলিতে পারে। কিন্তু আর এক ব্যাখ্যাও আছে,—মিশ্র ভাষায় পরমস্য ভাবঃ—'পারম্যং' শব্দটি 'পারমি' হইয়া যায়। বৌদ্ধ-সংস্কৃতেও 'পারমি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। তাহার উপর ভাবে 'তা' করিলে, পারমিতা হয়। অর্থ হয়,—পরমের ভাব,—সর্ব্বোৎকৃষ্টের ভাব। তাহা হইলে দানপারমিতা শীলপারমিতা প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থ হয়,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট দানের ভাব, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শীলের ভাব ইত্যাদি। ইহাতেও একটু দোষ হয়, উপরি উপরি দুবার ভাব প্রত্যয় হয়,—তাহা রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ দু'চারটা দেখা যায়। বোধিসত্ত্বগণ শীলরক্ষার জন্য বড় ব্যস্ত হইতেন না, অথবা সেটা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধই হইয়া যাইত। তাঁহারা শীলের চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জায়গায় মহাযান ও হীনযানে বড়ই তফাৎ দেখা যায়। হীনযানে 'বিরত' হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা হইত, "আমি প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, মিথ্যা কথা হইতে বিরত হইব"। বোধিসত্ত্বেরা যেন আপনাআপনিই তাহাতে বিরত ছিলেন—তাঁহারা সেই শীলের কিরূপে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন। হীনযানের শিক্ষা নিষেধমুখে, মহাযানের উপদেশ বিধিমুখে। হীনযানের যেন জীবনীশক্তি কম,—নাই বলিলেই যেন হয়। এটা করিও না, ওটা করিও না,—চুপ করিয়া থাক। মহাযানের এই জীবনীশক্তি বড় বেশী। তাঁহাদের একটি পারমিতার নামই 'বীর্য', অর্থাৎ বীরত্ব অর্থাৎ উৎসাহ। শীলরক্ষা করিয়া যাইব, ক্রমে এমন হইয়া উঠিবে যে আমি শীলরক্ষায় সকলের উপর উঠিব এবং অন্যে যাহাতে শীলরক্ষা করিতে বা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিব। হীনযানে 'বীর্য্য' শব্দটিই নাই। মহাযানে উহা একটি পারমিতার মধ্যে। শুধু সামান্য উৎসাহ নহে; এমন উৎসাহ যে উহা হইতে আর বেশী কল্পনা করা যায় না।

শ্রাবকযানে চারিটি ধ্যানের কথা খুব শুনা যায়। চারিটি ধ্যানের নাম পাওয়া যায় না। একটিতে বিতর্ক থাকে, আর একটিতে থাকে না। একটিতে প্রীতি থাকে আর একটিতে থাকে না। একটিতে সুখ থাকে

আর একটিতে থাকে না। যাহাতে সুখও থাকে না সেইটিই চরম ধ্যান। তাহার পর ভিক্ষু ক্রমে 'স্রোতাপন্ন' 'সকৃতাগামী' ও 'অনাগামী' হইয়া পরে অর্হৎ হন। মহাযানে ধ্যানের কথা আছে, এ চারিটি ধ্যানের কথাও আছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও অসংখ্য ধ্যান ও সমাধির কথাও আছে। ধ্যান ও সমাধি লইয়া তাঁহাদের অনেক পুস্তক আছে। স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এসকল শব্দ মহাযানে পাওয়া যায় না। ইহার বদলে পাওয়া যায় 'দশবোধি সত্ত্বভূমি' অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব যেমন ধ্যান, ধারণা, দান, শীল, ক্ষান্তি ইত্যাদিতে ক্রমে দক্ষ হইতে থাকেন, তাঁহার মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকে। মানুষের মনোবৃত্তি অনন্ত। প্রথম ভূমিতে কতকগুলি থাকে, কতকগুলি ত্যাগ করা হয় এবং কতকগুলি প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় ভূমিতে আবার কতকগুলি আসে, প্রথমের কতকগুলি, হয় একেবারে চলিয়া যায়, নয় ত হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্ব দশটি ভূমি অতিক্রম করিলে তবে তিনি নির্ব্বাণপথের যথার্থ পথিক হইতে পারেন। যে করুণার নাম পর্য্যন্ত শ্রাবকযানে দেখা যায় না, সেটি বোধিসত্ত্বের চিরসহচর, যতই উচ্চ ভূমিতে উঠিবেন ততই করুণা প্রবল হইতে থাকিবে।

পাঁচটি পারমিতায় দক্ষতালাভ করিলে তাহার পর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। 'প্রজ্ঞাপারমিতাই' আসল পারমিতা। একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাপারমিতা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য পারমিতা সকল পারমিতানামই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শুধু প্রজ্ঞাপারমিতাও ঠিক নহে। অপর পাঁচের সহিত প্রজ্ঞাপারমিতা মিলিত হইলে পূর্ণ পারমিতা হয়। প্রজ্ঞাপারমিতার মোট কথা এই যে সত্য দুই প্রকার,—সাংবৃত সত্য ও পরমার্থ সত্য। সাংবৃত সত্য,—ব্যবহারিক সত্য। আমরা চারিদিকে যেসকল জিনিস দেখিতে পাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া না লইলে ব্যবহার চলে না; তাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, যে তাহার একটিও সত্য নহে। পরমার্থ সত্য কখনই অন্যথা হয় না, যে চিরকালই সত্য থাকে, সেটিকে মহাযানেরা শূন্য বলেন।

হীনযান ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাযানেরও ত্রিশরণ-গমনের ব্যবস্থা আছে। ত্রিশরণগমনের মন্ত্র দুই যানেই এক, তবে মহাযানে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নহে, ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। বুদ্ধকে প্রথম স্থান হইতে নামাইয়া দ্বিতীয় স্থানে দিবার অর্থ এই যে মহাযান বুদ্ধ হইতে ধর্ম্মকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। মহাযানে শাক্যমুনির অবস্থা একটু শোচনীয়,—তিনি একটি 'মানুষী' বুদ্ধ। মানুষীবুদ্ধদেব মধ্যেও তাঁহার স্থান সাতের দাগে। এখনকার মহাযানেরা বলেন যে হিন্দুদের ব্যাস যেমন সব জিনিস কলমবন্দী করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শাক্যসিংহও তেমনি মাত্র কলমবন্দী করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মত, আমাদের ধর্ম্ম আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা মত চালাইয়াছেন, তাঁহারা 'ধ্যানীবুদ্ধ'। 'অমিতাভ' একজন 'ধ্যানীবুদ্ধ'। মহাযানে তাঁহার প্রভাব খুব অধিক। জাপানে তাঁহার খুব উপাসনা হয়। বৈরোচন আর একজন বড় 'ধ্যানীবুদ্ধ'। ক্রমে মহাযানের শেষ অবস্থায় পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ মানিত। নেপালের স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূচৈত্যের চারিদিকে এই পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির আছে। সেখানে শাক্যসিংহের স্থান নাই দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কোথায়"? আমার সঙ্গে বজ্রাচার্য্য ছিলেন, তিনি আমাকে চৈত্য হইতে কিছুদূরে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বে নীচু হইতে পাহাড়ে উঠিবার যে পথ ছিল, তাহারই উপরে শাক্যসিংহের প্রতিমা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "তিনি এইখানে আছেন, তিনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের একপ্রকার দ্বারপাল। আমরা তাঁহাকে মানি, যেহেতু তিনি আমাদের সব জিনিস কলমবন্দী করিয়া দিয়াছেন।"

বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম্ম মহাযানে বড়। স্তূপ বা চৈত্যই ধর্ম্ম। সেই চৈত্যের গায়ে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মন্দির, সুতরাং ধর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধের কি সম্পর্ক তাহা এইখানেই বুঝা গেল। নেপালের মহাযানদিগের মধ্যে সঙ্ঘ বলিতে গেলে একবিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে তাহাদিগকে বুঝায়; কিন্তু উহারা বলে সঙ্ঘ ক্রমে বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ ছিল, মহাযান খুব বাড়িয়া উঠিলে তাহাই হইল প্রজ্ঞা উপায় ও বোধিসত্ত্ব। ধর্ম্ম হইলেন প্রজ্ঞা, একথা বুঝান কঠিন

নহে। কারণ বৌদ্ধেরা, বিশেষ মহাজানেরা, ঘোর জ্ঞানবাদী। তাহারা ভাবে জ্ঞানই মুক্তি। ধর্ম্ম যদি জ্ঞান হইলেন তবে বুদ্ধ কি হইলেন—উপায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া, বাস্তবিক তাঁহাকে উপায় করিয়া, আমরা জ্ঞান পাইতে পারি। প্রজ্ঞা ও উপায় যখন ধর্ম্ম ও বুদ্ধের স্থান অধিকার করিলেন, তখন বিহারবাসী ভিক্ষুরা ত আর সঙ্ঘ হইতে পারেন না, তখন সঙ্ঘ আর একটা কিছু উঁচু জিনিস হওয়া চাই। তখন সঙ্ঘ হইলেন—বোধিসত্ত্ব।

এইরূপে আমরা হীনযান ও মহাযান যতই তুলনা করি, ততই দেখিতে পাই, ততই আমাদের মনে হয়, যে হীনযান ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি লইয়া ব্যস্ত, আর মহাযান দার্শনিক মত লইয়া ব্যস্ত ও পারমিতা লইয়া ব্যস্ত। স্বভাবচরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া কোন উচ্চতর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বড় হয়। হীনযান মানুষকে সেইরূপ বড় করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান তাহাতে তৃপ্ত হইতেন না। তাঁহারা মানুষকে সর্ব্বময় সর্ব্বনিয়ন্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। দর্শনে তাঁহারা শূন্যবাদী, নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই তাঁহারা আপনাদিগকে বড় বা 'মহা' মনে করিতেন ও শ্রাবক ও প্রত্যেকযানকে 'হীন' বা ছোট মনে করিতেন।

মহাযান কোথা হইতে আসিল?

অনেকেই মনে করেন যে নাগার্জ্জুনই মহাযানমত চালাইয়া দেন। তাঁহার 'মাধ্যমকবৃত্তি' মহাযানের প্রথম গ্রন্থ। তিনিই পাতাল হইতে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য আর্য্যদেব এই মত চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। চীনেরা বলে "আর্য্যদেব অধ্যাত্মবিদ্যার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন"। এই দুইজনই মহাযানের আদিগুরু। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে নাগার্জ্জুনের পূর্ব্ব হইতেই মহাযানমত চলিতেছিল। নাগার্জ্জুনের দুই পুরুষ পূর্ব্বে অশ্বঘোষ 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' মহাযানমতে ভরপূর। 'শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' তর্জ্জমা করিতে করিতে জাপানী পণ্ডিত সুজুকী বলিয়াছেন অশ্বঘোষেরও পূর্ব্বে মহাযানমত চলিত। 'লঙ্কাবতার' প্রভৃতি তিনখানি মহাযানসূত্র অশ্বঘোষের পূর্ব্বেও চলিত ছিল; সুতরাং মহাযানের আদি ঠিক বলিয়া উঠা কঠিন।

বৌদ্ধেরা বলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্থবিরেরা, বুদ্ধদেব যেরূপ বিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একচুল তফাৎ হইতে চাহিত না, কিন্তু যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অনেক বিষয়ে স্থবিরদিগের মতে চলিত না। বুদ্ধদেবের কঠিন শাসন ছিল। বারটার পর কেহ আহার করিবে না। তাহারা বলিত এক আধ ঘণ্টা পরে খাইলে দোষ কি? বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে কিছুই সঞ্চয় করিতে দিতেন না। তাহারা বলিত সিংএর ভিতর যদি একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাতে কি দোষ হইতে পারে। এইরূপে দশটি বিষয় লইয়া স্থবিরদিগের সহিত তাহাদের মতের অনৈক্য হয়। এইরূপ অনৈক্য হওয়াতে যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারা একটি সভা করিয়া এ সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে চান। বৈশালীতে এক মহাসভা হয়। এই সভায় কিছুই মীমাংসা হইল না, কিন্তু অধিকাংশ বৌদ্ধ স্থবিরের দল

হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুইদল হইল,—স্থবিরবাদ বা থেরাবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক। একে ত মহাসাঙ্ঘিকদিগের দলে লোক অধিক ছিল, তার পর আবার তাহাদের বয়স অল্প, উহারা মহা উৎসাহে আপনাদের মত প্রচার করিতে লাগিল। উহারা প্রথম হইতেই লোকোত্তরবাদী হইল। অর্থাৎ বুদ্ধদেব সামান্য মানুষ ছিলেন না, তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহার মত চলিতেছে, যখন তাঁহার মতে লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, আপনাদিগের আচার-ব্যবহার স্থির করিয়া লইতেছে, তখন তিনি শুধু মরিলে কি হইল? তাঁহার একটা অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় অস্তিত্ব আছেই। লোকোত্তরবাদীরা যতই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বাহির করিতে লাগিল, স্থবিরবাদীরা ততই বিনয় সম্বন্ধে বেশী কড়া হইতে লাগিল। দুইদলে যে আর কখনও মিল হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা রহিল না। অশোকরাজার সময়ে পাটলিপুত্রে যে মহাসভা হয়, তাহাতে মহাসাঙ্ঘিকেরা কেহই স্থান পায় নাই। সকল বৌদ্ধেরা সে সভাকে সভা বলিতেই প্রস্তুত নহে। মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযানদিগের মতে সে সভার কোন অস্তিত্বই নাই। অশোকরাজা স্থবিরবাদীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে এই মতই অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকপরিমাণে প্রচার করেন, সুতরাং সিংহলে স্থবিরবাদ চলিয়া যায় ও এখনও চলিতেছে। মগধ ও বাঙ্গলায় এই মতেরই লোক অধিক ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এবং পাঞ্জাবে মহাসাঙ্ঘিকেরাই প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে এই দুই দলই নানা শাখায় ভাগ হইয়া যায়। স্থবিরবাদের প্রধানতঃ দুই শাখা হয়,—'মহীশাসক' ও 'বজ্জিপুত্তক'। মহীশাসকেরা আবার দুইভাগ হয়,—'সর্ব্বত্থবাদী' ও 'ধর্ম্মগুপ্তক'। সর্ব্বত্থবাদ ক্রমে কশ্যপীয়, সংকান্তিক, ও সুত্তবাদ হইয়া যায়। বজ্জিপুত্তকদের চারি শাখা হয়,—'ধম্মথানীয়' 'ছন্দাগারিক', 'ভদ্দজানিক' ও 'সম্মতীয়'।

মহাসাঙ্ঘিকদিগের দুই দল হয়,—'গোকুলিক' ও 'একব্যোহারিক'।

গোকুলিকদিগের আবার তিন শাখা হয়—'পঞ্ঞত্তিবাদ', 'বাহুলিক' ও 'চেতিয়বাদ'। এতদ্ভিন্ন দেশভেদেও অনেকগুলি শাখা হয়,—'হেমবন্ত', 'রাজগিরীয়', 'সিদ্ধত্থক' 'পূর্ব্বশেলিয়' 'অপরশেলিয', 'বাজিরীয়'। কিন্তু কি লইয়া যে এই সকল শাখা ভেদ হয় তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

এইসকল ভিন্নশাখার মধ্যেও পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ছিল। বিবাদ বিসম্বাদ হইলেই লোকে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ দুর্ব্বল অবস্থাতেই সামবেদী সুঙ্গগোত্রের ব্রাহ্মণেরা অশোকের রাজ্য ধ্বংস করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহারা বৈদিক আচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমেই পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অশোকের উপর তাঁহাদের যে রাগ ছিল, সে রাগ তুলিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র, ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি চারিবার বৌদ্ধদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনও অনেক বৌদ্ধ পুষ্যমিত্রের নাম মুখে আনে না, এবং তাঁহার নাম শুনিলে গালি দেয়। অশোকরাজা ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যময় পশুবধ করিয়া যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার হ্রাস করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং অশোকের দলের উপরই পুষ্যমিত্রের রাগ যে বেশী ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। তাহা হইলেই বুঝা যায় স্থবিরবাদীরাই পুষ্যমিত্রের কোপে পড়িয়াছিলেন এবং তাহাদের উপর তাঁহার অত্যাচার অধিক হইয়াছিল। বিশেষ আবার তাঁহারাই পুষ্যমিত্রের রাজধানীর নিকট বাস করিতেন। মহাসাঙ্ঘিকেরা অনেকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতেন, কিন্তু অধিকাংশই তাঁহার রাজ্যের বাহিরে পঞ্জাব প্রভৃতি যবনদিগের রাজ্যে পড়িয়াছিলেন। একে ত নানা শাখা হওয়ায় বৌদ্ধেরা আপনা আপনিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল,—পুষ্যমিত্রের নির্য্যাতনে তাহাদের দুর্ব্বলতা আরও বাড়িয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন ও পহ্লব প্রভৃতি জাতির রাজত্ব হইল। মহাসাঙ্ঘিকেরা সেখানে যাইয়া বিদেশীয় রাজগণকে আপনাদের মতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল,—ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যও হইল। কিন্তু এরূপ কৃতকার্য্য হইতে প্রায় দুইশত

বৎসর লাগিয়াছিল। নির্য্যাতন হইলেই আপনার ঘর একটু বাঁধিয়া উঠে। অনেক বৌদ্ধগণ আপনার শাখার অস্তিত্ব ভুলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরই যাহাতে রক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। মহাসাঙ্ঘিকেরা কণিষ্ক রাজার সময় জলন্দরে একটি মহাসভা করে। সে সভায় স্থবিরবাদীরা বড় স্থান পায় নাই। ঐ সভায় তাহারা আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক ও তাহার টীকা ও আপনাদের ধর্ম্মমত স্থির করিয়া লন। অনেকে বলেন এইখানে মহাযান-মতাবলম্বীরা উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া তাহারা বড় একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু একথা বিশ্বাস হয় না, কারণ কণিষ্করাজার গুরু অশ্বঘোষ নিজেই মহাযানমতের পোষক ছিলেন। আমার বোধ হয় এই সভারই মহাসাঙ্ঘিকেরা মহাযানরূপে পরিণত হয়, কারণ মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযানে অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসাঙ্ঘিকেরাও বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। মহাসাঙ্ঘিকেরা দশভূমি মানিত, ইহারাও দশভূমি মানিত। মহাসাঙ্ঘিকেরা দার্শনিক মতের পক্ষপাতী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। তবে মহাসাঙ্ঘিকদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্ববাদ তত প্রবল হয় নাই,— করুণাবাদের ত নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয় মহাসাঙ্ঘিকেরাই ক্রমে ক্রমে মহাযান হইয়া দাঁড়ান, কিন্তু 'মহাসাঙ্ঘিক' হইতে মহাযানমতে উপস্থিত হইতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ঠিক কথা বলিবার যো নাই, কারণ মহাসাঙ্ঘিকদিগের একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে;—সেখানি "মহাবস্তু অবদান"। বইখানিতে লেখা আছে "আর্য্যমহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং পাঠেন" অর্থাৎ লোকোত্তরবাদী মহাসাঙ্ঘিকদিগের এই পুস্তক। এইখানি যে কি ভাষায় লেখা, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। যে ভাষায় 'ললিতবিস্তারের' অধ্যায়ের শেষের গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের' গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গুণরত্নসঞ্চয় গাথা' লেখা, এও সেই ভাষায়। মথুরার ছোট ছোট শিলালেখগুলি যে ভাষায় লেখা, এও সেই ভাষায়। যে

ভাষায় নাসিক, কার্লি প্রভৃতি গুহায় সাতকর্ণি রাজাদের শিলালেখগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। ইহা কতক কতক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে চলে, কতক কতক সে ব্যাকরণ একেবারে মানে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম দিয়াছেন 'গাথাভাষা'। সিনার সাহেব এ ভাষার নাম দিয়াছেন (mixed Sanskrit) মিক্সড্ সংস্কৃত। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন ভারনাকুলারইজড্ সংস্কৃত (vernacularised Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্যান্স্ক্রিটাইজড্ ভারনাকুলর (Sanskritized vernacular),—যেমন আমাদের পণ্ডিতী বাঙ্গলা। কাব্যাদর্শকার ভারতবর্ষে চারি ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন,—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র, কিন্তু তিনি মিশ্রভাষার উদাহরণ দিয়াছেন "মিশ্রন্তু নাটকাদিকং"। তাঁহার এ উদাহরণটি ঠিক হয় নাই, কারণ তিনি ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়া সাহিত্যের উদাহরণ দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি যখন লিখিয়াছিলেন, তখন একটি প্রাচীন কারিকায় ভাষাগুলির নাম পাইয়াছিলেন, সেই কারিকাটি তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সময় মিশ্র ভাষা চলিত না, তাই 'মিশ্রন্তু নাটকাদিকং' বলিয়া একটা যা তা উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। 'মহাবস্তু অবদানে'র ভাষা বাস্তবিকই মিশ্রভাষা। এ ভাষায় 'বাস্তু' 'বস্তু' হইয়া যায়, তাই যেখানে অশ্বঘোষ কপিলবাস্তু লিখিয়াছেন, সেখানে 'মহাবস্তু অবদানে' 'কপিলবস্তু' লেখা আছে। এরূপ সংস্কৃতকে বাঁকাইয়া ফেলা বাঙ্গলায় বিরল নহে,—যেমন আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় 'সমভিব্যাহার' শব্দ 'সমিভ্যার' হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের বিশেষ করিয়া এই ভাষাটির আলোচনা করা উচিত।

মহাসাঙ্ঘিক হইতে কেমন করিয়া মহাযান হইল, তাহা জানার এই একখানি বই আর পুস্তক নাই। কণিষ্কের সময় যে সকল পুস্তক লেখা হইয়াছিল, তাহার একখানিও এখনও পাওয়া যায় নাই। চীনে তাহার কয়েকখানা পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। শুনিয়াছি সকৃডিয়ানায় মহাসাঙ্ঘিকদিগের এক শাখা চলিত,—শুনিয়াছি মধ্য এসিয়ায় মহাসাঙ্ঘিকদিগের আর এক শাখার মত চলিত, কিন্তু তাহারও কোন পুস্তক

এ পর্য্যন্ত চক্ষে পড়ে নাই। 'মহাবস্তু অবদানে'র পর এবং নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বে যত পুস্তক রচনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা 'লঙ্কাবতার সূত্র' দেখিতে পাই, আর অশ্বঘোষের তিন চারিখানি পুস্তক দেখিতে পাই। ইহাতেই দেখা যায় যে মহাযানের মূল মতগুলি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। মহাবস্তু অবদানে দশভূমির কথা আছে, বুদ্ধত্ব লাভেরও কথা আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্ববাদ নাই। 'লঙ্কাবতারে' বোধিসত্ত্ববাদ সামান্যভাবে আছে। অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দে আছে, তোমার নিজের উদ্ধার হইলেই নিশ্চিন্ত থাকিও না, পরকেও উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে। তোমার কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি অপরকে উদ্ধার কর ইত্যাদি। এ সকলেই আমরা মহাযানমতের মূল দেখিতে পাইতেছি। লঙ্কাবতারে কথা তুলিয়াছে 'তথাগত' কি অবিনশ্বর?

অনেকে মনে করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে মিলাইবার জন্য নাগার্জ্জুন মহাযানমতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে বুদ্ধদেবের পর কোন মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি "ভগবদ্গীতা" রচনা করেন। ভগবদ্গীতার মত মহাসাঙ্ঘিকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাযান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধ মতের অনেক প্রমাণ আছে। একথাটি বুঝাইতে গেলে একটু বাজে কথার দরকার এবং সে বাজে কথা কহার দরুণ কেহ যেন কিছু মনে না করেন।

নেপালীরা বলে ধর্ম্ম দুই প্রকার হইতে পারে। খাঁটি ধর্ম্ম দুরকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম্ম,—(১) দেবভাজু (২) গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা কর, না হয় গুরুকে ভজনা কর। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান দুইই গুভাজু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, তাহারা বুদ্ধকেই মানে, বুদ্ধই তাহাদের গুরু, বুদ্ধকেই তাহারা মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করে, কোন দেবতাকেই তাহারা উপাসনা করে না, তবে তাহাদিগকে হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য বলিয়া কেমন করিয়া মনে করিব? বরঞ্চ হীনযানে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিতে

বলে, কিন্তু মহাযানে সেটুকু বড় দেখা যায় না। একজন আচার্য্য তাঁহার এক সেবককে ভিক্ষু করিবার জন্য বড়ই চেষ্টা করিতেন। সেবক বলিত "মহাশয়, আমার এখনও সময় হয় নাই"। কিছুদিন পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য্য মহাশয় আমার আর ভিক্ষু হইবার দরকার নাই, আমি একেবারে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছি"। আচার্য্য বলিলেন, "কিসে এমন হইল?" সে বলিল, "এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই ইচ্ছা হয় ইহাকে খুন করিয়া ফেলি।" আচার্য্য বলিলেন, "তবে ঠিকই হইয়াছে।" ইহার উপরেও কি বলিব, যে মহাযান হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য মাত্র। তবে এক কথা,—একদেশে যদি দুই তিন ধর্ম্মের লোক থাকে, তবে তাহাদের আচার ব্যবহার ক্রমে কতকটা এক হইয়া যায়। আমাদের দেখাদেখি ভদ্রঘরের মুসলমানের মেয়েরা বিধবা হইলে আর বিবাহ করিতে চায় না, মুসলমানের দেখাদেখি আমরাও পীরের শিরণী দিই। ফিরিঙ্গীরা কালীর কাছে মানত করে। এই মানতের দৌলতে কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটে ফিরিঙ্গীকালীর মন্দিরে মার্ব্বেলের মেজে হইয়া গিয়াছে। এসকল গৃহস্থের মধ্যে চলিতে পারে; কিন্তু যাহারা ধর্ম্মের কর্ত্তা তাদের ভিতর এসব করিলে চলে না। তাহাদের আপন আপন ধর্ম্মের মত ঠিক মানিয়া চলিতে হয়, নহিলে গৃহস্থেরা তাহাকে মানিবে কেন?—তাহার কথাই বা শুনিবে কেন?

মহাযানের কিন্তু বাহাদুরী আছে। যতদিন মহাসাঙ্ঘিক ছিল, ততদিন তাহাদের মধ্যে নানরূপ মতভেদ ছিল, আর পরস্পর বেশ রেষারেষিও ছিল, কিন্তু মহাযানের পর সেটা আর বড় দেখা যায় না। সবাই আপনাকে মহাযান বলিয়া পরিচয় দিতেই ব্যগ্র হয়। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মহাযানের দুইটা প্রকাণ্ড দার্শনিক মত, কিন্তু উভয়ই মহাযান এবং মহাযান বলিয়া উভয়েই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে অন্য কোন বিষয় লইয়া দলাদলি আছে তাহা বোধ হয় না। আর মহাযান হইতে এই যে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাও সকলে আপনাদিগকে মহাযান বলিয়াই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি? আমার বোধ হয় মহাযান-

ধর্ম্মের উদারতাই ইহার কারণ। জগৎ উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য। যে যে প্রকারই করুক্ না কেন, তাহাতে আমাদের বৃদ্ধি বই ক্ষতি নাই। সুতরাং আমাদের পরস্পর বিবাদবিসম্বাদ কেন? জগৎ একটা প্রকাণ্ড বস্তু, একা কিছু উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং তুমি যাহা করিলে, সেও আমার কার্য্য, আমি যাহা করিলাম, সেও তোমার কার্য্য। তাহা লইয়া তোমায় আমায় ঝগড়া হইবে কেন?

মহাযান কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর এই যে, মহাসাঙ্ঘিকেরাই ক্রমে মহাযান হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত উহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মহাযানের সৃষ্টি হয় নাই; মহাযানের উদ্দেশ্য মহৎ, উহা সকল ধর্ম্মকেই আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে পারে।

সহজযান

মহাযানমতে নির্ব্বাণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিয়া 'দশভূমি' অতিক্রমপূর্ব্বক শূন্যের উপর শূন্য, তা'র উপর শূন্য পার হইয়া, তবে নির্ব্বাণ-পদ লাভ হয়। এত ত লোকে করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একটা সহজ পথ চাই। সে সহজ পথ কোথা হইতে আসে?

মহাযানে ত 'সাংবৃত সত্য' বা সংসারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে এবং "পরমার্থ সত্য"কে শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। নির্ব্বাণ ও শূন্য একই। মাধ্যমিকেরা শূন্যকে "চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত" বলিয়াছে—অতএব উহা 'অস্তি'ও নয়, 'নাস্তি'ও নয়, 'তদুভয়'ও নয়, 'অনুভয়'ও নয়। তবে উহা কি?—অনির্ব্বচনীয় রূপ। কিন্তু উহার ধারণা ভাবরূপে হয়, অভাবরূপে নয়—ইংরাজীতে বলিতে গেলে 'Positive', 'Negative' রূপে নয়। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে ঐ অবস্থায় শূন্য বিজ্ঞানমাত্র। ইহাও 'ভাব'। সহজবাদীরা বলিলেন, তোমাদের সংসারও যেমন মিথ্যা, নির্ব্বাণও তেমনই মিথ্যা। মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপ পুণ্য বলিয়া কোন জিনিসই নাই।

সহজধর্ম্মের অনেক বই বাঙ্গলায় লেখা। হওয়াই উচিত। যদি নির্ব্বাণটাকে সহজই করিতে হয়, তবে উহাকে সংস্কৃত দিয়া কঠিন করা কেন? বাঙ্গলায় বলিলে উহা ত আরও সহজ হইবে। তাই তাঁহারা বাঙ্গলাতেই সহজধর্ম্ম প্রচার করেন। সরহপাদ বাঙ্গলায় বলিলেন;—

> অপণে রচি রচি ভব নিব্বাণা,
> মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা।
> অম্ভে ণ জানহু অচিন্ত জোই—
> জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
> জইসো জাম মরণ বি তইসো
> জীয়ন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো।

জা এথু জাম মরণে বিশঙ্কা
সো করই রসরসায়েরে কথা ॥

লোকে বৃথা আপনা-আপনি সংসার ও নির্ব্বাণ মনে মনে রচনা করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। আমি অচিন্ত্যযোগী--আমি জানি না জন্ম মরণ ও ভব কিরূপ? জন্মও যেরূপ, মরণও সেইরূপ; জীয়ন্তে ও মরণে কোনই বিশেষ নাই। জন্ম ও মরণে যাহার শঙ্কা, সেই রস ও রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক।

ভাদেপাদের কথা এই :-

এতকাল হাঁউ আছিলেঁ স্বমোহেঁ
এবে মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ।
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা—
গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা ॥
পেথমি দহদিহ সর্ব্বই সুন
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন।
বাজুলে দিল মোহকখু ভণিআ
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ
চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥

এতকাল আমি আমার মোহেতেই ছিলাম। এখন আমি সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম। এখন বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ একেবারেই নাই। তিনি টলিয়া গগন-সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন। আমি দেখিতেছি দশদিক্ সকলই শূন্য। চিত্তই যখন নাই, তখন পাপও নাই, পুণ্যও নাই। আমার বজ্রগুরু আমার মোহের কুঠারি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি গগনে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছি। ভাদেপাদ বলিতেছেন, ভাগ ত নাই, আমি আমার চিত্তরাজকে আহার করিয়া ফেলিয়াছি, অর্থাৎ, তাহাকে 'নিঃস্বভাব' করিয়াছি।

এই দুইটি গান হইতে আমরা কি বুঝিতে পারিতেছি? যখন সবই শূন্য—তখন উৎপত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, ভঙ্গও নাই; জন্মও নাই,

মরণও নাই, সংসারও নাই। 'চিত্ত' 'চিত্ত' বলিয়া যে পদার্থ আছে বল, তাহাও ত শূন্যসমুদ্রে পড়িয়া মিশাইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। সকল জিনিসই যখন নিঃস্বভাব, তখন আমার চিত্তেরই যে স্বভাব থাকিবে, তাহারই বা অর্থ কি? আমি যতদিন নিজে জন্ম-মরণ-সংসারের ভাবনা ভাবিতেছিলাম, ততদিন আমি মোহে বা ধোকায় পড়িয়াছিলাম। ঠিক্ গুরুর কাছে ঠিক উপদেশ পাইয়া, আমি বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ নাই। আমি চিত্তরাজকে 'আহার' করিয়া ফেলিলাম।

যোগাচারমতে যেমন--কিছুই থাকে না বিজ্ঞানমাত্র থাকে, সহজমতে তেমনই কিছুই থাকে না, আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনও বা মহাসুখ বলেন। সে সুখ স্ত্রীপুরুষসংযোগজনিত সুখ। ইঁহাদের মতে চারিটি শূন্য আছে—নীচের শূন্য কিছুই নয়, আলোক মাত্র; চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। সে শূন্য আপনি উজ্জ্বল। সেই শূন্যে চিত্তরাজ গিয়া উঠিলেন, তাহার পর নিরাত্মাদেবীর সহিত মহাসুখে মগ্ন হইয়া "নিঃস্বভাব" হইয়া গেলেন।

সহজযানের মূল কথা—সদ্গুরুর উপদেশ।

এই যানের কথা :—

> ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্ব্বক্লেশপ্রহাণকম্।
> নির্ব্বাণঞ্চ পদং শান্তমবৈবর্ত্তিকমাপ্নুয়াৎ॥ [শ্রীসমাজতন্ত্র]

বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্ব্বাণপদ পাওয়া যায় না। যে নির্ব্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্ব্বাণের চরম ফল, যে নির্ব্বাণে আর 'বিবর্ত্ত' থাকে না, অর্থাৎ, কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।

গুরুর কথা শুনিলে তাঁহার হিত উপদেশ পাইলে, তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিবে। [বজ্রজাপ]

গুরুর প্রসাদেই পরম সুখলাভ হয়, সে সুখ নিজেই বুঝিতে পারা যায়, পরেও আমাকে বুঝাইতে পারে না, আমিও পরকে বুঝাইতে পারি না। সে সুখে তন্ময়তা লাভ হয়, অর্থাৎ সুখ ভিন্ন জগতের অন্য কোন পদার্থের

অস্তিত্ব থাকে না, সে সুখ গুরু হইতেই উদয় হয়। অনেক পুণ্য থাকিলে, গুরুর অনেক উপাসনা করিলে, সে সুখ লাভ হইয়া থাকে।

[সরহপাদপ্রবন্ধ]

সে গুরুকে আমরা বজ্রগুরু বলি কেন? বজ্র বলিতে শূন্যতা বুঝায়। যোগরত্নমালায় লিখে—

দৃঢ়ং সারমশৌষীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে॥

শূন্যতাই বজ্র। উহা ছেদ করা যায় না, ভেদ করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, উহাতে ছেঁদা করা যায় না—উহা অতি দৃঢ় ও সারবান্। যে গুরু এই শূন্যতাবজ্রের উপদেশ দেন, তিনিই বজ্রগুরু।

গুরুর উপদেশে যাহা লাভ হয় সে লাভ শতসহস্র সমাধিতে হয় না। আমাদের এই যে সহজযান ইহাতে গুরুর উপদেশই লইতে হয়, ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, পাপ পরিহারের চেষ্টা বৃথা, কঠোর ব্রত ধারণের চেষ্টা বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়মপালন করাও বৃথা।

শ্রীসমাজতন্ত্রে বলিতেছেন—

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈর্মূর্ত্তিঃ শুষ্যতি দুঃখিতা।
দুঃখাদ্বিক্ষিপ্যতে চিত্তং বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরন্যথা॥

যদি তুমি কঠোর নিয়ম পালন কর, তাহা হইলে তোমার শরীর শুষ্ক হইবে, ও তোমার নানারূপ দুঃখ উপস্থিত হইবে। দুঃখ উপস্থিত হইলে, মন স্থির থাকিবে না, মনস্থির না থাকিলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না।

হেবজ্রতন্ত্রেও বলিতেছে—

রাগেন বধ্যতে লোকে রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥

বিষয়ের আসক্তিতেই লোকে বদ্ধ হয়, আবার সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়। আসক্তির এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা বুদ্ধতীর্থিকেরা এটা জানিত না, অর্থাৎ অন্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা জানেনা, আমরা সহজপন্থীরাই, কেবল জানি।

আবার শ্রীসমাজ বলিতেছেন :—

পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্নৈব পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ॥

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, বিষয়কেই ভোগ বলে, বিষয়কেই কাম বলে। সেই পাঁচটি ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যার দ্বারা আপনাকে পীড়া দিবে না। যোগতন্ত্রানুসারে সুখভোগ করিতে করিতে বোধির সাধনা করিবে।

সরহপাদ বলিতেছেন :—

তনুতরচিত্তাঙ্কুরকো বিষয়রসৈর্যদি ন সিচ্যতে শুদ্ধৈঃ।
গগনব্যাপী ফলদঃ কল্পতরুত্বং কথং লভতে॥

যখন চিত্ত অল্পে অল্পে বোধির দিকে যায়, তখন সেই চিত্তরূপ ছোট অঙ্কুরটির গোড়ার বিষয়রস যদি না সেক কর, কেমন করিয়া সেই অঙ্কুর কল্পতরু হইবে, কেমন করিয়া সে আকাশ ছাইয়া ফেলিবে, কেমন করিয়া সে সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে?

এই সকল সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে, যে যদি তোমার বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ কর।

পঞ্চকাম উপভোগ ত সকলেই করে। তাহার জন্য আবার শাস্ত্র কেন, তাহার জন্য আবার ধর্ম্ম কেন? সে ত সকলে আপনা হইতেই করে। তাহার জন্য আবার গুরু কেন? একটু আছে। মানুষমাত্রেই পঞ্চকামোপভোগ করে। কিন্তু তাহাতে তাহারা পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন, যে সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই, তখনই সহজীয়ারা পঞ্চকামোপভোগ করে ও পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না। তাই দারিকপাদ বলিলেন :—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণেবখানে।
অপইঠান মহাসুহলীলে দুলখ পরমনিবাণে॥
দুখেঁ সুখেঁ একু করিআ
ভুঞ্জই ইন্দিজানী।
স্বপরাপর ন চেবই
দারিক সঅলানুত্তরমানী।

অরে বালযোগি, তোর মন্ত্রেই বা কি? তন্ত্রেই বা কি? ধ্যানেই বা কি? ব্যাখ্যানেই বা কি? তোমার যখন মহাসুখলীলায় প্রতিষ্ঠা নাই, তখন নির্ব্বাণ তোমার পক্ষে দুর্লভ। তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ কর। দারিক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার আত্মপর বোধ নাই।

তিনি এই সঙ্গেই আবার বলিতেছেন—

রাআ রাআ রাআরে অবররাঅ মোহেরা বাধা।
লুইপাঅপএ দারিক দ্বাদশভুবণেঁ লধা॥

আর যত রাজা আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ। কিন্তু নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন অতিক্রম করিয়া দারিক পরমসুখ লাভ করিয়াছেন।

মহাসুখ লাভ করিলে সহজীয়াদের কি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে আগমে এই কথা বলে।

ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীব মনোঽন্তর্বিশতীব চ।
নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সৎসুখমূর্চ্ছিতঃ॥

শরীর যখন সৎসুখে মূর্চ্ছিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল যেন ঘুমাইয়াই পড়ে, মন মনের ভিতর ঢুকিয়া যায়। শরীরের কোনরূপ চেষ্টা থাকে না।

এই যে পঞ্চকামোপভোগ—ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি? সে বিষয়ে অনুত্তরসন্ধিতে এই কথাটি দেখা যায়।—

সর্ব্বাসাং খলু মায়ানাং স্ত্রীমায়ৈব বিশিষ্যতে।
জ্ঞানত্রয়প্রভেদোঽয়ং স্ফুটমত্রৈব লক্ষ্যতে॥

সকল মায়ার মধ্যে স্ত্রীমায়াই বড়। ইহাতেই তিনটি জ্ঞানের যে প্রভেদ, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তিনটি জ্ঞান – প্রথম তিনটি শূন্য। সে তিনটি যে কিছুই নয়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় এবং বিরমানন্দ রূপ যে চতুর্থ শূন্য তাহা পাইতে পারা যায়। এই চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। ইহাতেই নিরাত্মাদেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া চিত্ত মহাসুখে লীন হয়।

সবরপাদ বলিতেছেন :—

তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহনা বাড়ী তাত্রলা।
কিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিলা॥
কঙ্গুরি না পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুখে ভেলা॥

তৃতীয় বাড়ীর (সন্ধ্যাভাষায় বাড়ী বলিতে শূন্য বুঝাইল) পাশে জ্যোৎস্না বাড়ী বা জ্যোৎস্না শূন্য। সেখানে জ্ঞানচন্দ্র সর্ব্বদা উদিত। সেখান হইতে সকল অন্ধকার, সকল দুঃখ পলাইয়াছে। সেখানে আকাশপুষ্প সত্যসত্যই ফুটিয়া আছে। সেখানে কাঁকুড় পাকিল না (সন্ধ্যাভাষায় কাঁকুড় শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপী সুখ; পাকিল না, অর্থাৎ শেষ হইল না। অর্থাৎ, সুখই রহিল।) শবর ও শবরী (বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবী) উন্মত্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। শবরের জ্ঞান—চৈতন্য কিছুই রহিল না। তিনি অনুক্ষণ মহাসুখে ডুবিয়া রহিলেন।

এই যে মত ইহা সাধারণ লোককে যে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। লোকে যাহা চায়, সহজীয়ারা তাহাই দিল; কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও। শুধু কথায় বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। তাহারা নানা রাগরাগিণীতে এই সকল গান গাহিয়া বেড়াইত, এবং দেশের লোককে একেবারে মাতাইয়া তুলিত। তাহারা কি কি যন্ত্র ব্যবহার করিত, জানা যায় না। তাহাদের খোল করতাল ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে একতারা ছিল বলিয়া জানা যায়—প্রমাণ—বীণাপাদ বলিতেছেন ;—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী।
বাজই আলো সহি হেরুকবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা॥

সূর্য্য হইলেন লাউএর বস্—অর্থাৎ পাকা লাউএর শক্ত খোলা, তাহাতে চাঁদ, তাঁত বা তন্ত্রী লাগিল, অনহা অর্থাৎ অনাহতকে দণ্ড করা হইল ও অবধূতী বাকি অর্থাৎ বাজনাওয়ালা হইল। হে সখি ঐ শুন হেরুকের বীণা

বাজিতেছে। আর সেই তন্ত্রীধ্বনিতে শুনিয়া ও করুণা বিলাস করিতেছে।

এই যে বীণাধ্বনি ইহা একরকম music of the sphereএর মত, অথবা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মত। মিউসিকে যে বীণাধ্বনিতে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভরিয়া যায়, হেরুকের বীণাধ্বনিতেও ত্রৈধাতুকময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া গেল।

তাহারা পটহ বা ঢোল বাজাইত :—

বেটিল হাক পড়ৎ চউদিশ [ভুসুকুর গান]

তাহারা ডমরু ব্যবহার করিত, মাদলও বাজাইত :—

অণহা ডমরু বাজএ বীরনাদে [কৃষ্ণাচার্য্য]

ভবনিব্বাণে পড়হ মাদলা "

মণ পবণ বেণি করণ্ডকশালা [কৃষ্ণাচার্য্য]

তাহাদের দুন্দুভি ছিল।

জঅ জঅ দুন্দুভি সাদ উছলিআঁ

কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ [কৃষ্ণাচার্য্য]

তাঁহারা যে সকল গান গাহিতেন, তাহার অনেকগুলি রাগ এখনও সঙ্কীর্ত্তনে চলিতেছে।

যথা :—রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বরাড়ী, রাগ গুঞ্জরী, রাগ শীবরী, রাগ কামোদ, রাগ মল্লারী, রাগ দেশাখ, রাগ ভৈরবী, রাগ মালসী, রাগ গবুড়া, রাগ রামক্রী, রাগ বঙ্গাল ইত্যাদি।

পদকর্ত্তারা সন্ধ্যাভাষায় গান করিতেন। সন্ধ্যাভাষা অর্থাৎ আলো-আঁধারে ভাষা। উপরে কথায় কথায় একরূপ মানে হয়, অথচ ভিতরে অন্যরূপ গূঢ় অর্থ থাকে। ইহাকে রূপক বলিতে চাও, বল। কিন্তু রূপকে দুই অর্থই প্রকাশ থাকে। বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখন বিবাহ বলিতেছেন, কখন তরুলতা সাজাইতেছেন, কখন হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া বলিতেছেন, কখন দুধ-দোহা বলিতেছেন, কখন বা শুঁড়িনীর মদ বেচার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন বা নদীর উপর সাঁকো গড়ার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন শূন্য ও করুণার মিলন দেখাইতেছেন,

কখন গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন ইঁদুরের সহিত তুলনা করিতেছেন। এইরূপ নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ছন্দে নানা অলঙ্কারে তাঁহারা সহজমত নানাদিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যাঁহারা গান লিখেন, তাঁহাদের নাম পদকর্ত্তা এবং তাঁহাদের গানের নাম পদ। বৌদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনে যাঁহারা গান লিখিতেন, তাঁহাদিগকেও পদকর্ত্তা বলিব। তাঁহারা যে গান লিখিতেন তাহার নাম চর্য্যাপদ বা গীতিকা। তাঁহারা চর্য্যাপদ ছাড়া আরও পদ লিখিতেন— যেমন বজ্রপদ বা বজ্রগীতিকা, উপদেশ পদ বা উপদেশগীতিকা।

তখন অনেক বড় বড় লোকেও গীতিকা লিখিতেন। যিনি বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশাও বাঙ্গলায় গীতিকা লিখিতেন। যে রত্নাকর শান্তির নামে আর্য্যাবর্ত্তের দার্শনিকেরা ভয় পাইতেন, তিনিও গীতিকা লিখিতেন। অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ ত গীতিকা লিখিতেনই, এতদ্ভিন্ন আসামী, উড়িয়া ও মৈথিলেরাও গীতিকা লিখিতেন। সহজ ধর্ম্মের গুরুদিগকে সংস্কৃতে বজ্রগুরু বলিত, বাঙ্গলায় বাজিল বজুল ও বজগু বলিত। লোকে মনে করিত ইহাদের নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইঁহারা দাড়ীগোঁপ কামাইতেন, মাথায় বড় বড় চুল রাখিতেন, আলখেল্লা পরিতেন। এখন যেমন আউলেরা, তাঁহারাও কতকটা তেমনই গান করিয়া বেড়াইতেন।

ইঁহাদিগকে সময়ে সময়ে সিদ্ধাচার্য্য বলিত। তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যের পূজা হইয়া থাকে। অনেক সিদ্ধাচার্য্যদের মূর্ত্তি তাঁহাদের দেশে আছে। লুইপাদ সিদ্ধাচার্য্যের আদি, তাঁহাকে লোকে সিদ্ধাচার্য্য বলে। লোকে বলে সর্ব্বশুদ্ধ চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। লুইএর বাড়ী বাংলা-দেশে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তিব্বতদেশের সাহিত্যে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তিনি মৎস্যের অন্ত্র বা মাছের পোঁটা খাইতে ভালবাসিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল, মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুর মানে, তাহারা অনেকেই লুইকেও মানে এবং লুইয়ের উদ্দেশে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। লুইএর পূজার দিন তাহারা সেই

পাঁটা বলি দেয়। যদি কেহ সেই পাঁটা চুরি করিয়া খায়, তবে তাহার অত্যন্ত অমঙ্গল হয়। নগেনবাবু বলেন, ময়ূরভঞ্জের যে অংশটুকু রাঢ় বলে, সেখানেও লুইএর পূজা হইয়া থাকে। লুইএর বংশে আরও কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন, এবং বাঙ্গলায় গান লিখিয়াছিলেন।

এখন বৈষ্ণবদের যেমন আখড়াধারী আছে, সিদ্ধাচার্য্যেরা যদি তেমনই আখড়াধারী ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, এবং এখন আখড়াধারীদের যেমন অনেক চেলা থাকে সেইরূপ সিদ্ধাচার্য্যদেরও অনেক চেলা ছিল, যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে তখন বাঙ্গলার কিরূপ অবস্থা ছিল ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণদিগের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে তখন হাজার ঘরও ছিল কি না খুব সন্দেহ। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সিদ্ধাচার্য্যগণ ও তাঁহাদের চেলারা দেশের একরূপ কর্ত্তা ছিলেন। একে ত তাঁহাদের ধর্ম্ম অতি সহজ, মানুষে যাহা চায়, তাই তাঁহারা দিতেন। তাহাও আবার বক্তৃতার ছটায় নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নয়, সংস্কৃতের ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশ দিয়া নয়। গানে, নানা সুরে, নানা বাদ্যের সঙ্গে গান করিয়া তাঁহারা লোকদের বলিয়া দিতেন, "বাপুহে সবই ত শূন্য—সংসারও শূন্য, নির্ব্বাণও শূন্য—তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোকা মাত্র।

এই ধোকার পশরা নামাইয়া ফেল। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ কর। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।"

এই যে আনন্দময় উপদেশ, ইহার ফলে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে মাতার ফল যে ভাল হয় নাই, তাহা ত আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যাঁহারা মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, মানুষের মনের উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। তাঁহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু চেলাদের যে কি পরিণাম হইবে, তাহা তাঁহারা একেবারেই ভাবেন নাই। তবে তাঁহারা আমাদের একটা বড়

উপকার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাটিকে সজীব, সতেজ, সরল ও মধুর করিয়া গিয়াছেন এবং বৌদ্ধজগতে তাহাকে একটি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই ইঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইঁহারা যে সহজ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম্ম এখনও চলিতেছে, তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজীয়ারা আপনারাই সহজভাবে মত্ত থাকিতেন, এখন সহজীয়ারা দেবতাদের সহজভাবে ভোর হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন, এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপাত

সহজযানের কথা বলিয়াছি। সহজযানের ফল যে অতি বিষময় হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্র-বিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযানের মহত্ত্ব, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য আর্য্যদেব 'চরিত্র-বিশুদ্ধি-প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্র-বিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্ব্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম 'নেড়ানেড়ী'র দলে গিয়া দাঁড়াইল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলোআঁধারী ভাষা। কাণে শুনিবামাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গূঢ় অর্থ অতি ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড এই দেহের মধ্যে আছে, তাহাই দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং দেহে আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, সুমেরু সবই রহিল। যে বোধিচিত্ত মহাযানমতে নির্ব্বাণ পাইবার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া তাহার যে কি দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইব না। জানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। দেশের লোকে এই ইন্দ্রিয়াসক্ত বৌদ্ধদিগকে কি চক্ষে দেখিত তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের তৃতীয় অঙ্কটি একবার মন দিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ঐ নাটকখানি ১০৯০ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়। উহাতে বৌদ্ধ ও জৈন যতিদের যে 'কেচ্ছা' দেওয়া আছে, তাহা পড়িলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তখনও খুব বড়মানুষ, কাষায় বস্ত্র অথবা ছোবান কাপড় পরেন; কিন্তু

সে রেশমের কাপড়। পুঁথি পড়েন—সে পুঁথির পাটায় সোণালী কাজ করা; যে কাপড়ে পুঁথি বাঁধা থাকে, তাহা রেশমের, তাহার উপর নানারকম কাজকরা। ভিক্ষুরা তখনও খুব বাবু, বিলাসী ও তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত।

এই অধঃপাতের একটা দিক্। আর একটা দিক্ হইতে অধঃপাতের কারণ দেখাই। মহাযান ধর্ম্ম খুব উঁচু ধর্ম্ম—সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু মহাযান বুঝিতে, আয়ত্ত করিতে ও মহাযানের মত কর্ম্ম করিতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়—অনেক পড়িতে হয়-অনেক ভাবনাচিন্তা করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত না। মহাযানের আচার্য্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন—তাহারা বলিয়া দিয়াছিলেন—তোমরা 'ধারণী' মুখস্থ কর—'ধারণী' জপ কর—ধারণীর পুঁথি পূজা কর। তাহা হইলেই তোমাদের মহাযানের পাঠ স্বাধ্যায়—যোগ—সকলের ফল হইবে। মনে কর 'প্রজ্ঞাপারমিতা' একখানি বৃহৎ গ্রন্থ—পড়িতে অনেক দিন লাগে—আয়ত্ত করিতে আরও দিন লাগে—তাহার মত কাজ করিতে আরও দিন লাগে। আচার্য্য বলিয়া দিলেন 'প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়-ধারণী'—মুখস্থ কর—তাহা হইলেই তোমার প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠের সমস্ত ফল হইবে। এইরূপ যদি "ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ কীলে কীলে তথাগতোহধ্যবসাস্তে বরদে উত্তমোত্তমতথাগতে ভব ক্রীং ফট্ স্বাহা"—এইটি কণ্ঠস্থ কর তাহা হইলে গণ্ডব্যূহসূত্র পাঠের ফল হইবে।

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ ধুণু ধুণু ক্রীং ফট্ স্বাহা"—এই ধারণী পাঠ করিলে সমাধিরাজসূত্র পাঠের ফল হইবে।

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ মনিধরি বাজ্রণি মহাপ্রতিসরে ক্রীং ক্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা"—এই মন্ত্র পাঠ করিলে মহাপ্রতিসরা পাঠের ফল হইবে।

এইরূপ যে কত ধারণী তৈয়ার হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক "বৃহদ্ধারণী সংগ্রহে" আমরা চারিশত এগারটি ধারণী পাইয়াছি। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তখন এক অক্ষর—

দুই অক্ষর—মন্ত্র হইতে লাগিল। মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। তখন 'হুং' 'ফট্' 'ক্রীং' 'স্বাহা' এই সকল শব্দের প্রচুর ব্যবহার হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ইহাতেই আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। যে মহাযান ধর্ম্ম চিন্তাশক্তির চরম সীমায় উঠিয়াছিল মন্ত্রযানে তাহা ক্রমে 'হুং' 'ফট্' 'স্বাহায়'—দাঁড়াইল। ইহা কি অধঃপাত নহে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দেবতার সংস্রব নাই—দেবতার পূজা-অর্চ্চা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কতদিন পরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এখনও মতভেদ আছে—কেহ বলেন চারি শত বৎসর পরে, কেহ বলেন পাঁচ শত বৎসর পরে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে গেলে গান্ধার-শিল্পের কুঠরীতে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বুদ্ধের পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে নির্ম্মিত হয়। মহাযানেও শাক্যসিংহের মূর্ত্তি বিহারে বিহারে থাকিত। তাঁহারা উহাকে নির্ব্বাণলাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে একটি একটি করিয়া ধ্যানী বুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম 'অমিতাভ', তারপর 'অক্ষোভ্য', তারপর 'বৈরোচন', তারপর 'রত্নসম্ভব', তারপর 'অমোঘসিদ্ধি' আসিয়া জমিলেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মগধ-কুঠরীতে অনেকগুলি চৈত্য বা স্তূপ আছে। তাহার চারিদিকে চারিটি 'তথাগতের' মূর্ত্তি আছে। প্রথম তথাগত 'বৈরোচন' স্তূপের মধ্যেই থাকিতেন। তাহার জন্য স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইত না। ক্রমে তিনিও আসিয়া অগ্নিকোণে জমিলেন। শাক্যসিংহ তখন একেবারে উপায় হইয়া গিয়াছেন—স্তূপে তাঁহার স্থান নাই—তাঁহার স্থান বিহারের মধ্যস্থলে যে মন্দির—তাহাতে। তখনকার বৌদ্ধেরা বলিতেন, তিনি 'পঞ্চতথাগতের' অথবা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের কলম মাত্র—তিনি পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মত কলমবন্দী করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে এই পঞ্চতথাগতের পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তিগণের নাম—'লোচনা', 'মামকী', 'তারা', 'পাণ্ডরা', 'আর্য্যতারিকা'। বহুকাল অবধি তাঁহারা মন্ত্রে থাকিতেন, তাঁহাদের মূর্ত্তি ছিল না—ক্রমে তাঁহাদেরও মূর্ত্তি হইল। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চশক্তিতে

পাঁচজন 'বোধিসত্ত্ব' হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'মঞ্জুশ্রী' ও 'অবলোকিতেশ্বর' প্রধান। বর্ত্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্রকল্পে 'অমিতাভ' প্রধান বুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর—প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্ত্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল—অনেক পদ হইতে লাগিল—অনেক মস্তক হইতে লাগিল;—তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বুদ্ধগণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। এক 'অভিধ্যানাত্তরতন্ত্রে' 'সম্বরবজ্র' 'পীঠপর্ব্ব' 'বজ্রসত্ত্ব' 'পীঠদেবতা' 'ভেরুক' 'যোগবীর' 'পীঠমালা' 'বজ্রবীর-ষড়্‌যোগসম্বর' 'অমৃত-সঞ্জীবনী' 'যোগিনী' 'কুলডাক' 'যোগিনী যোগহৃদয়' 'বুদ্ধকাপালিকযোগ' 'মঞ্জুবজ্র' 'নবাক্ষরালীডাক' 'বজ্রডাক' 'চোমক' প্রভৃতি অনেক ভৈরব ও যোগিনীর পূজাপদ্ধতি আছে। বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে। যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে সাধনমালা বলে। একখানি সাধনমালায় দুই শত ছাপ্পান্নটি সাধন আছে। 'বজ্রবারাহী', 'বজ্রযোগিনী', 'কুরুকুল্লা', 'মহাপ্রতিসরা', 'মহামায়ূরী', 'মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী' প্রভৃতি অনেক যোগিনীর ধ্যান ইহাতে আছে। এই সকল সাধন লইয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণে বৌদ্ধকারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্ত্তি লইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চলিতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের বাকী কি রহিল?

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে 'গুহ্যপূজা' আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব—কাহাকেও দেখিতে দিব না; এ পূজার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সে সকল দেবমূর্ত্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ সকল মূর্ত্তির নাম—উহারা বলিত শম্বর। একে ত অশ্লীল মূর্ত্তি—তাহাতে ভাল কারিগরের হাতের তৈয়ারী—তাহাতে অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল মূর্ত্তি যখন বুদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল—তখন আর

অধঃপাতের বাকী রহিল কি? সে সকল উপাসনার প্রকার আরও অশ্লীল—সভ্যসমাজে বর্ণনা করা যায় না। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এই সকল পুঁথি 'ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র'। আমি বলি তিনি ইহা ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যেখানে কামশাস্ত্রের শেষ হয়, সেইখানে বুদ্ধদিগের গুহ্যপূজা আরম্ভ। অধিক পুঁথির নাম করিব না। 'গুহ্যসমাজ' বা তথাগত গুহ্যক নামে বৌদ্ধদের একখানি পুঁথি আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন,—

"But in working it out, theories are indulged in, and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of, and compared to which the words and specimens of Holiwell Street literature of the last Century would appear absolutely pure."

অর্থাৎ এই বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইঁহারা যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, যত জঘন্য স্বভাবেরই মানুষ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা ভয়ানক ও ঘৃণিত মত বা ক্রিয়াকর্ম্মের কল্পনাও করিতে পারে না। ইহার সহিত তুলনা করিলে গত শতকে হোলিওয়েল ষ্ট্রীট যে সকল পুঁথিপাজি বাহির হইত তাহা অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব প্রাণিহিংসার একান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'তথাগত গুহ্যকে' বলিতেছে—

"হস্তিমাংসং হয়মাংসং শ্বানমাংসং তথোত্তমম্।
ভক্ষয়েদাহারকৃত্যর্থন্ন চান্যন্তু বিভক্ষয়েৎ॥"
"অন্নং বা অথ বা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।
বিন্মূত্রমাংসযোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ॥"
"সময়চতুষ্টয়ং রক্ষ বুদ্ধজ্ঞানোদবিপ্রভোঃ।
বিন্মূত্রং তু সদা ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাদ্ভুতং॥"

এই ত গেল আহারের কথা। গুহ্যসিদ্ধি লাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই—নহিলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হইবে না।

অন্তকথা খুলিয়া বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করা হয়,—হয় ত পিনাল কোডের ধারায়ও পড়িতে হয়। তবে একটা কিছু না বলিলে নয়—তাই একটি নমুনা দিতেছি—

"দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ॥"

মোটকথা এই যে,

"দুষ্কৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।
সর্ব্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধতি॥"

অর্থাৎ দুষ্কর কঠোর নিয়ম করিয়া সেবা করিলে কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হয় না—সর্ব্বপ্রকার কামোপভোগ করিয়া যদি সেবা কর—তাহা হইলে নিশ্চয় শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হইবে।

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ, মালাগন্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি ত্যাগ, প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোন কাজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচার কর—যথেচ্ছাচার কর—যথেচ্ছাচার কর। অধঃপাতের আর বাকী কি?

'তথাগত গুহ্যকে'র ন্যায় আরও অনেক পুস্তক আছে। 'চণ্ডমহারোষণ তন্ত্র', 'চক্রসম্বর তন্ত্র', 'চতুষ্পীঠ তন্ত্র', 'উড্ডীষ তন্ত্র', 'সেকোদ্দেশ', 'পরমাদিবুদ্ধোদ্ধৃত কালচক্র', 'কালচক্রগর্ভতন্ত্র', 'সর্ব্ববুদ্ধসমাযোগ ডাকিনী-জাল-সম্বরতন্ত্র', 'হেবজ্রতন্ত্ররাজ', 'আর্য্যডাকিনীবজ্রপঞ্জরমহাতন্ত্ররাজকল্প', 'মহামুদ্রাতিলক', 'জ্ঞানগর্ভ', জ্ঞানতিলক নামে 'যোগিনীতন্ত্ররাগপরম-মহাদ্ভুত', 'তত্ত্বপ্রদীপ', 'বজ্রডাক', 'ডাকার্ণব', 'মহাসম্বরোদয়', 'হেরুকাভ্যুদয়', 'যোগিনীসঞ্চার্য্য', 'সম্পুটতন্ত্র', 'চতুর্যোগিনী সম্পুট', 'গুহ্যবজ্র' ইত্যাদি। আর কত নাম করিব—কত নাম করিয়া পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব? এ সকল তন্ত্র 'তথাগত গুহ্যক' হইতে একবিন্দুও ভাল নয়। যখন এইরূপ শত শত পুস্তক আছে—সে সকল পুস্তক পড়া হইত—সেইরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম হইত—তখন আর অধঃপাতের বাকী কি?

এ সকল গুহ্যতন্ত্র—মূলতন্ত্র—সঙ্গীতি আকারে লেখা। সঙ্গীতির গোড়াতে এইরূপ থাকে—

"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান শ্রাবস্ত্যাং
জেতবনে বিহরতি স্ম, অথবা রাজগৃহে বেণুবনে, বিহরতি স্ম, অথবা
এইরূপ আর কোনও স্থানে বিহরতি স্ম"

অর্থাৎ আমি শুনিয়াছি একদিন ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরে অথবা রাজাগৃহে বেণুবনে অথবা আরও এইরূপ কোথাও বেড়াইতেছেন। এই সকল গুহ্য উপাসনার গ্রন্থগুলিও এই ভাবে লেখা, তবে শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম নাই—তাহার বদলে যাহা আছে তাহা কলমের মুখে আসে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এই সকল গুহ্যবিদ্যার পুস্তকের আবার টীকা, টিপ্পনি, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, উহার প্রয়োগপদ্ধতিপ্রকরণ আছে। মূল যদি বিশখানি থাকে—টীকা টিপ্পনীতে তাহা পাঁচশত হইয়া দাঁড়ায়। একজন ইউরোপীয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন—ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে এই সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে। ভবিষ্যতে কোন্ হতভাগ্য পণ্ডিতের অদৃষ্টে যে সে দুর্ভোগ আছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সে দুর্ভোগ না ভুগিলেও এত বড় জাতিটা—এত বড় ধর্ম্মটা—কেন যে অধঃপাতে গেল, তাহা ত বুঝা যায় না। তাই কাহাকেও না কাহাকে একদিন সে দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। কিন্তু যে ভুগিবে সে সত্য সত্যই ভারতের একটা মহা উপকার সাধন করিয়া যাইবে। সে অন্ততঃ বলিবে—"বাপু! এ পথে আর আসিও না—এ পথে আসিলে অধঃপতন অবধারিত।"

বুদ্ধদেব দেবতা মানিতেন না। মানুষ আপনা হইতেই চরিত্রশুদ্ধি করিয়া ক্রমে লোকে যাহাদের দেবতা বলে তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ যে পরমপদ—যে পদে গেলে জন্ম জরা মরণের আর ভয় থাকিবে না—যে পদে গেলে সংসারের কোন চিন্তা থাকে না—যে পদে গেলে মহাশান্তি লাভ করা যায়—সেই পদে উঠিতে পারিবে। তাঁহার শিষ্যেরা শেষ ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপুতনা,

কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারাও অধঃপাতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেশটাসুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্ম্মে অনেকদিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ ছয় শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল—ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল। সমাজে আসল ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল। গৃহস্থ ভিক্ষুদের আদর তত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল 'আর্য্য'। আসল ভিক্ষুরা আর্য্যদের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু আর্য্যরা অনার্য্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের সন্তানসন্ততি হইত—তাহারা আপনাআপনি ভিক্ষু হইয়া যাইত। একজন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত—তাহাকে প্রথম 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করিতে হইত—তাহার পর 'পুণ্যানুমোদনা' শিখিতে হইত, 'পাপদেশনা' শিখিতে হইত, 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'অষ্টশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'দশশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'পোষধব্রত' ধারণ করিতে হইত—আরও কত কি করিতে হইত—অনেক সময় যাইত। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে—সে একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে সকল জিনিস অন্যকে বহুকালে শিখিতে হইত, সে সেসকল বাড়ীতেই শিখিত—তবে আমাদের যেমন এখন পৈতা হয়—একটা সংস্কার মাত্র—উহাদেরও ঐ রকম 'ত্রিশরণগমন', 'পঞ্চশীল গ্রহণ', এক একটা, সংস্কারের মত হইয়া যাইত। আমাদের দেশে যেমন "জাত বৈষ্ণব" বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে—সেকালেও তেমনি 'জাত ভিক্ষু' বলিয়া একটি জাতির মত হইয়াছিল। উহাদের যত দলপুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত—ভিক্ষাও করিত—কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ

বা রাজমন্ত্রী হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত—অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্ম্মও করিত, পূজা পাঠও করিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৌরোহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম—ঘরে বসিয়া করা যায় একটু হাত পাকিলে কাজও ভাল হয়—দু'পয়সা আসেও বেশী, গৃহস্থ ভিক্ষু সেই সকল কাজ করিত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম করিবার সময়ও থাকিত—বড় বড় উৎসবে দু'চার পয়সা খরচও করিতে পারিত। কিন্তু বেশী লেখাপড়া শেখা, ধ্যানধারণা করা, ভাবনাচিন্তা করার সময়ও থাকিত না—প্রবৃত্তিও থাকিত না। তাহা হইলেই মোট দাঁড়াইল এই যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৌরোহিত্যটা মূর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমিজমার আয় হইতে কোনরূপে দিন গুজরাণ করিতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্ম্মী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত হইলে যে রাজসম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজারাও ছোট ছোট রাজা—আপনাদের পণ্ডিত পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্ম্মী বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য ছিল না—থাকিলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা তাহা করিতে দিত না। সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে আফ্‌গানিস্তানের উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এবং মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কাফের বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও আসিতেছেন; ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইঁহাদের অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তখন বাঙ্গলায় ত সেনবংশ রাজা—কিছু বড় রাজা মাত্র। আশে পাশে চারিদিকে অনেক ছোট ছোট রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমসুমারি লওয়া হয়। সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে আট শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। আট শত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু হিন্দু ছিল—

অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা পুতুল পূজা খুব করিত। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রোকটা বৌদ্ধদের উপরই পড়িয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধদের বিহারগুলি সব ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এক ওদন্তপুরী বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল। বিহারটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল; পাথরের মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ফেলা হইল; সোণা রূপা তামা পিতল কাঁসার মূর্ত্তিগুলি গালাইয়া ফেলা হইল; পুঁথিগুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্রমশীল বিহারেরও এই দশাই হইয়াছিল। নালন্দা জগদ্দল প্রভৃতি বড় বড় বিহারের এই দশা হইল। ওদন্তপুরী বিহারের ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—নালন্দা বিহারেরও ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমশীল ও জগদ্দলের এখনও কোন খোঁজ হয় নাই। আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই একরূপ লোপ হইয়াছে। যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কতক বর্ম্মায় ও সিংহলে গিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গলায় বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুঁথি পাঁজির এই পর্য্যন্ত শেষ।

এক একবার মনে হয় তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্ম্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখান—এই সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গদেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল। দেশে রহিল—কারিগর পুরোহিত ও তাহাদেরই যজমান। লেখাপড়া বুদ্ধিবিদ্যার নামগন্ধ পর্য্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে লোপ পাইল। ইহার পর কি হইল পরে বলা যাইবে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথায় গেল ?

মুসলমানের আক্রমণে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বাঙ্গলা হইতে লোপ হইয়াছে একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে মুসলমান যাইতে পারে নাই, সেখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কিছু কিছু ছিল। ইংরাজেরা যেরূপ সমস্ত দেশ একেবারে দখল করেন, মুসলমানেরা সেরূপ পারেন নাই। অনেক স্থানেই যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ছোট ছোট রাজ্য দখল করিতে হইয়াছিল। গিয়াসউদ্দিন বোলবন্ যখন তুগ্রলের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ১২৮০ খৃঃ অব্দে সোণারগাঁওএর রাজার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন নবদ্বীপ ও গৌড়জয়ের পর পূর্ব্ববাঙ্গলা জয় করিতে মুসলমানদের প্রায় একশত কুড়ি বৎসর লাগে। সোণার-গাঁওএর রাজারা যে সব হিন্দু ছিলেন বোধ হয় না। কারণ পূর্ব্ববাঙ্গলায় অনেক বৌদ্ধ ছিল। আমরা বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা একখানি পঞ্চরক্ষার পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথিখানি ১২১১ শকাব্দায় বা ১২৮৯ খৃঃ অব্দে লেখা। পঞ্চরক্ষার পুঁথিখানি বৌদ্ধ, উহাতে পাঁচখানি পুঁথি আছে। পাঁচখানিই আরম্ভ হয়—

"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান" ইত্যাদি। লেখক বলিতেছেন এ সময়ে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মধুসেন আমাদের রাজা। মধুসেন যে পূর্ব্ব বাঙ্গলারই রাজা ছিলেন একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না, তবে কুলগ্রন্থে বল্লালের পর মধুসেন বলিয়া একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ না পাইলে আমরা মধুসেনকে বল্লালসেনের বংশধর বলিতে চাহি না। তবে ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশে একজন স্বাধীন বৌদ্ধরাজা ছিলেন একথা বেশ বলা যায়। এবং তাঁহার দেশে যে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত সে কথাও বলা যায়।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি চৌদ্দ শতকের শেষকালে তাঁহার প্রসিদ্ধ স্মৃতির গ্রন্থসকল রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' খুব চলিত। তিনি একটি বচন তুলিয়াছেন যে নগ্ন দেখিলেই প্রায়শ্চিত্ত

করিতে হইবে। নগ্ন শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"নগ্নাঃ বৌদ্ধাদয়ঃ"। বৌদ্ধ না থাকিলে তিনি এরূপ অর্থ করিতে পারিতেন না। আমি একখানি বাঙ্গালা অক্ষরের তালপাতায় লেখা বোধিচর্য্যাবতারের পুঁথি পাইয়াছি। সেখানি বিক্রম সংবতের ১৪৯২ অব্দে লেখা অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৩৬ সালে। বোধিচর্য্যাবতারখানি মহাযানের পুঁথি—বৌদ্ধদিগের গভীর দর্শনের পুঁথি। পুঁথিখানি সোহিনচরী প্রদেশে বেণুগ্রামে মহত্তর মাধবমিত্রের পুত্রের জন্য নকল করা হয়। একজন বৌদ্ধভিক্ষু উহা লেখেন আর একজন উহার পাঠ মিলাইয়া দেন। সুতরাং বাঙ্গালার অনেক কায়স্থ যে তখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন একথা বেশ বোধ হয়। কেম্বিজে একখানি বাঙ্গালা হাতে তালপাতায় লেখা বৌদ্ধধর্ম্মের পুঁথি আছে। সেখানি ইংরাজী ১৪৪৬ সালে লেখা। সেখানি মূল কালচক্রতন্ত্রের পুঁথি। পুঁথিখানি শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রী কোন বিহারে দান করিয়াছিলেন। লেখক মগধদেশীয় ঝাড়গ্রামনিবাসী করণকায়স্থ শ্রীজয়রাম দত্ত। উহাতে লেখা আছে "পরম ভট্টারক ইত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ" অর্থাৎ জয়রাম দত্ত পূর্ব্বে আরও অনেক পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। ব্রিটিস্ মিউজিয়ামে এইরূপ আর একখানি তালপাতার পুঁথি আছে, সেখানি ১৪৮৯ বিক্রম সংবৎ বা ১৪২৩ খৃঃ অব্দে লেখা। এখানি কাতন্ত্রের উণাদিবৃত্তি। বৌদ্ধস্থবির শ্রীবররত্ন মহাশয় আপনার পাঠের জন্য লিখাইয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন কপ্‌লিয়া গ্রামের কায়স্থ শ্রীবাগীশ্বর। ব্রিটিস্ মিউজিয়মে শ্রীবররত্নের জন্য লেখা আরও অনেকগুলি কাতন্ত্র ব্যাকরণের পুঁথি আছে। তাহার মধ্যে দুই একখানি বাঙ্গালা ভাষায়ও লেখা আছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে তৎকালে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধবিহার ছিল বৌদ্ধস্থবির ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্র বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িতেন। শ্রীবররত্নের যে সকল বিশেষণ দেওয়া আছে তাহাতে তিনি যে মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একটি বিশেষণ এই "শূন্যতাসর্ব্বকারবরোপেত মহাকরুণী" "সর্ব্বা-লম্বনবিবর্জ্জিতাদ্বয়বোধিচিত্তচিন্তামণিপ্রতিরূপক"। সুতরাং পনর শতকেও বাঙ্গালায় অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ছিল এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুঁথিপাঁজীও লেখা হইত। এই শতকে রাঢ়ীশ্রেণী মহিন্তা গাঁই বৃহস্পতি নামে একজন বড়

পণ্ডিত গৌড়ের সুলতান, রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারীগণের নিকট "রায়মুকুট" এই উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি একখানি স্মৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়া বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উপকার করিয়া যান। তাঁহার অমরকোষের টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ পনরখানি বৌদ্ধ-পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অমরকোষের টীকার তারিখ ইংরাজী ১৪৩১ সাল। তাহা হইলে তখনও বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্ততঃ শব্দশাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধ পুঁথি পড়িতে বাধ্য হইতেন—একথা বেশ বুঝা যায়।

চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয় ইংরাজী ১৫৩৩ সালে। তাহার পর তাঁহার অনেকগুলি জীবন-চরিত লেখা হয়। চূড়ামণি দাস একখানা চৈতন্য-চরিত লেখেন। তাহাতে লেখা আছে চৈতন্যের জন্ম হইলে সকলেই আনন্দিত হয় তাহার মধ্যে বৌদ্ধেরাও আনন্দিত হয়। জয়ানন্দ আর একখানি 'চৈতন্য-চরিত' লিখিয়াছেন। তিনি পুরীর জগন্নাথদেবকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ১৬ শতকেও বৌদ্ধেরা বাঙ্গালা হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

১৭ শতকে মঙ্গোলিয়া দেশে উর্গানামক নগরে এক মহাবিহারে তারানাথ নামে একজন প্রসিদ্ধ লামা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ আছে জানিবার জন্য ১৬০৮ সালে বুদ্ধগুপ্ত নাথ নামে একজন লামাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ ও তৈলঙ্গ ঘুরিয়া বাঙ্গালাদেশে আসেন। তিনি কাশ্রমগ্রাম ও দেবীকোট, হরিভঞ্জ, ফুকবাদ, ফলগ্রু প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এই সকল স্থানেই অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত ছিলেন, অনেক বৌদ্ধ পুঁথিপাঁজী ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মও খুব প্রবল ছিল। হরিভঞ্জ বিহারের ধর্ম্ম-পণ্ডিতের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষালাভ করেন। হেতুগর্ভধন নামে একজন পণ্ডিত উপাসিকা তাঁহাকে নানারূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইখানে তিনি অনেক সূত্রের মূলগ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরেও তিনি অনেক স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে পান। কিন্তু সে-সকল কথায়

আমাদের কাজ নাই। তাঁহার সময়ে রাঢ়ে ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেশ প্রবল ছিল। তিনি বোধগয়ায় মহাবোধিমন্দিরে ও বজ্রাসনের নিকটে অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে কোন বিহারে জনকায় সিদ্ধনায়ক ডাক প্রভৃতি অনেক মণ্ডলের চিত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি তৈলঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক ঘুরিয়াছিলেন। তিনি শান্তিগুপ্ত নামে একজন সিদ্ধের নিকট দীক্ষিত হইয়া "নাথ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার নাম হইয়াছিল "বুদ্ধগুপ্ত নাথ"। যোগিনী দিনকরা ও মহাগুরু গম্ভীরমতির নিকট তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি মহোত্তর সুধীগর্ভের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রাজগৃহের গৃধ্রকূট গিরিগুহায় ও প্রয়াগে অনেক বড় বড় তীর্থস্থান দেখিয়াছিলেন। তিনি খগেন্দিরি পাহাড়ের উপর যোগীদের থাকিবার জন্য এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

নেপালে ললিতপত্তন নামে এক নগর আছে। উহাকে এখন 'পাটন' বলে। এখানকার একজন বজ্রাচার্য্য ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে তীর্থ করিতে আসিয়া কিছুদিন মহাবোধিমন্দিরের নিকট বাস করেন। তখন তাঁহাকে স্বপ্ন হয়, তিনি যেন মহাবোধিস্তূপের মত একটি স্তূপ নিজের দেশে নির্ম্মাণ করেন। তিনি তিন বৎসর মহাবোধিতে থাকিয়া উহার একটি চিত্র আঁকিয়া লইয়া যান এবং পাটনে মহাবোধি নামে এক বিহার নির্ম্মাণ করেন। উহার ঠিক মধ্যস্থলে মহাবোধি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। পাটনের সে বিহার ও সে স্তূপ আজও আছে। নীচের দিকে একটু একটু লোণা ধরিয়াছে কিন্তু উপরের অংশ ঠিক আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বোধিগয়ার মন্দির ইংরাজেরা মেরামৎ করিয়া দিলে যেরূপ হইয়াছে সেটিও ঠিক সেইরূপ! মহাবোধি বিহারের বজ্রাচার্য্যেরা নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে আজিও অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া আসিতেছেন।

আঠার শতকের প্রথমে কাশীতে নাথুরাম নামে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে লোকে নথমল ব্রহ্মচারী বলিত। বদরিকাশ্রমের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি নামে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতেন না। তাঁহার সংস্কার ছিল সংবৎ

১৭৫৫, ৮ই মাঘ বুদ্ধদেব বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইবেন। ৫ই মাঘ বিষ্ণু শিব গণপতি শক্তি এবং সূর্য্য নথমলের নিকট আসিয়া তাঁহাকে মুখভাষাগ্রন্থ লিখিতে বলেন। সেই গ্রন্থে বুদ্ধের অবতার হওয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব প্রভৃতি অনেক কথা লেখা থাকিবে। তিনিও সেইমত কাশীর রামাপুরায় থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় চারি পাঁচ জন বিদ্যার্থীর সাহায্যে সাড়ে বার লক্ষ শ্লোকে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লেখেন। ঐ পুস্তকের খানিক খানিক কাশীর পুঁথিওয়ালাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। খানিকটা এসিয়াটিক সোসাইটীতেও আছে। কিন্তু সেটা মূল পুঁথি নয়—নকল করা। পুঁথির নাম এখন হইয়াছে 'বুদ্ধচরিত'। বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া শূরসেন দেশে বুদ্ধনামক এক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন।

মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন ভারতবর্ষে যে একটা বৌদ্ধ বলিয়া প্রবল ধর্ম্ম ছিল তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা ভারতবাসী সভ্যজাতিমাত্রকেই হিন্দু বলিতেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম দুইই তাঁহাদের কাছে হিন্দুধর্ম্ম ছিল। মিন্‌হাজ ওদন্তপুরী বিহার বিনাশের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে, মুসলমানেরা দুই হাজার সব মাথাকামান ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা "ওদন্তপুরী" বিহারকে "ওদনন" বিহার বলিতেন। সব মাথাকামান ব্রাহ্মণ হইতে পারে না একথা বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সন্ন্যাসীরাই সব মাথা কামায়। বিহারে ভিক্ষুরা সব মাথা কামাইতেন যেহেতু তাঁহারাও সন্ন্যাসী ছিলেন। আকবরের সময় নানাদেশের ও নানাধর্ম্মের পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার সভায় কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন না। ইংরাজেরা যখন প্রথম বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখনও তাঁহারা ইংরাজ-অধিকৃত দেশে কোন বৌদ্ধ দেখিতে পান নাই। কিরূপে বৌদ্ধদের নাম পর্য্যন্ত এদেশে লোপ হইয়া গেল, তাহা জানিতে হইলে প্রথম বৌদ্ধদের ইতিহাস জানা চাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকবার লেখা হইয়াছে যে, শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা বড় কদাচারী

হইয়াছিল—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা শেষ অবস্থায় ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিল সে অতি কদাকার। সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে প্রথম বিদ্রূপ করিতেন পরে ঘৃণা করিতেন। বিদ্রূপের একটা উদাহরণ "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়। হিন্দুরাজারাও বৌদ্ধদের বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যেখানে দেবোত্তর ভূমি আছে তাহার নিকটে ব্রাহ্মণকে "ব্রহ্মোত্তর" দিবে না। কিন্তু সেন রাজাদের ব্রহ্মোত্তর দানে দেখা যায় যে উহার একসীমা "বুদ্ধবিহারী দেবমঠঃ"। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রধান শত্রু রাজারাও ছিলেন না—ব্রাহ্মণরাও ছিল না—শৈবযোগীরাই উহাদের প্রধান শত্রু ছিল। শেষকালের বৌদ্ধগ্রন্থসকলে দেখিতে পাওয়া যায় শৈবযোগীদের উপর উহাদের বড়ই রাগ। স্বয়ম্ভূপুরাণ নেপালের রাজা যক্ষমল্লের সময়ে লেখা হয়। তিনি ইংরাজী চৌদ্দ শতকের শেষে রাজত্ব করিতেন। স্বয়ম্ভূপুরাণের শেষে শৈবদিগকে বিস্তর গালি দেওয়া আছে। বাঙ্গালাতেও বোধ হয় শৈবযোগীরাই ক্রমে প্রবল হইয়া বৌদ্ধদের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। চৈতন্যদেব অনেক নীচ অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার করিয়াছেন। অনেক সময় মনে হয়, এই সকল নীচ অস্পৃশ্য জাতিরা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল, এখন বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতেও বৌদ্ধধর্ম্মের নাম ক্রমে লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীর আশেপাশে বিশেষ উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল। দার্জ্জিলিঙ্গ, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত; নেপালে অনেক বৌদ্ধ ছিল; চাটগাঁয়ে অনেক বৌদ্ধ ছিল। চাটগাঁ ও ত্রিপুরার পাহাড়ে বরাবরই বৌদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে নেপালী বৌদ্ধেরাই সেকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী। দার্জ্জিলিঙ্গের বৌদ্ধরা প্রায়ই তিব্বত হইতে তাহাদের বৌদ্ধধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। সিকিম ও দার্জ্জিলিঙ্গে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে তাহার কতক ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। সেটা সমস্ত তিব্বত হইতে আসা। নেপালেও তিব্বতীরা আপনাদের প্রভাব কিছু কিছু বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু নেপালের অধিকাংশ বৌদ্ধই পুরাণ ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ।

চট্টগ্রামে যে বৌদ্ধেরা আছেন তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ নহেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা আরাকান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম লাভ করেন, সে ধর্ম্মও বর্ম্মা ও সিংহল হইতে আসিয়াছে। রাঙ্গামাটিতে যে সকল বৌদ্ধ আছেন তাঁহারা যদিও এখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের শিষ্য, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক আচার-ব্যবহার আছে, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ, কিন্তু নিকটবর্ত্তী চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহারা অনেক পরিমাণে হীনযান মত গ্রহণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নাই। বোধ নামে যে একটি করদ মহল আছে, তাহার নামেই প্রকাশ, যে উহাতে এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহামান্য শ্রীযুক্ত সার এডওয়ার্ড গেট সাহেব আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া পুঁথি ও কতকগুলি কাগজপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে বেশ বোধ হয় যে উড়িষ্যার সরাকী তাঁতিরা এখনও বৌদ্ধ। তাহাদের বিবাহের সময় বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। এই সরাকী তাঁতী যে কেবল জঙ্গল মহলেই আছে এমন নহে। পুরী জেলার দুই একটি থানায় এবং কটকেরও কয়েকটি থানায় সরাকী তাঁতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাও স্পষ্ট বুদ্ধদেবের পূজা করিয়া থাকে। আমাদের বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায়ও সরাকী তাঁতি আছে। তাহারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

কাজে বৌদ্ধ, নামেও বৌদ্ধ, এরূপ লোক অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু খাঁটি বৌদ্ধ আছে, অথচ নাম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, এরূপও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপে এই সকল বৌদ্ধকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত পরে দেওয়া যাইবে।

এখনও একটু আছে

পাঠানেরা তিন চারি শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম্ম ছিল। মোগলেরা দু'শ আড়াইশ বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম্ম ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও সে কথা জানা ছিল না। ইউরোপীয়েরা জানিতেন যে সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম, প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম চলিত,—সে ধর্ম্মের ভাষা পালি, ধর্ম্ম-যাজকেরা ভিক্ষু, বিবাহ করেন না,—ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৮১৬ সালে নেপালের সঙ্গে ইংরাজের সন্ধি হয়; সেই সন্ধির বলে ইংরাজরা নেপালের রাজনীতিতে একজন রেসিডেণ্ট রাখেন। হজসন সাহেব বহুদিন সেই রেসিডেন্সির ডাক্তার থাকেন, পরে তিনি রেসিডেণ্টও হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিতে পান। ১৮২৬ সালে তাঁহার পণ্ডিত অমৃতানন্দ 'ধর্ম্মকোষ-সংগ্রহ' নামে একখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিয়া হজসন সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। হজসন্ সাহেব বৌদ্ধধর্ম্ম ও নেপাল সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার অনেক মালমসলা এই সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা।

হজসনের পুস্তক পড়িয়া লোকের বিশ্বাস হয় যে, মহাযান নামে একপ্রকার বৌদ্ধধর্ম্ম বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে চলিতেছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই সেই ধর্ম্ম চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে—ক্রমে চীন ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক সংস্কৃত পুস্তকের তর্জ্জমা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে লোকের আগ্রহ আরও বাড়িয়া ওঠে। হজসন সাহেব বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সংস্কৃত পুঁথি নকল করাইয়া কলিকাতা, পারিস ও লণ্ডন নগরে পাঠাইয়া দেন। নেপাল রেসিডেন্সির আর একজন ডাক্তার, রাইট সাহেব অনেকগুলি তালপাতার ও কাগজের বৌদ্ধ-পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন।

হজসন সাহেব কলিকাতায় যে সকল পুঁথি দেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭৮ সালে তাহার ক্যাটালগ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার পীড়া হয়; তিনি আমাকে তাঁহার সাহায্য করিতে বলেন। আমিও সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম। ১৮৮২ সালে তাঁহার ক্যাটালগ বাহির হয়। উহার নাম Nepalese Buddhist Literature। ঠিক এই সময় বেণ্ডল (Bendall) সাহেব, রাইট সাহেব কেম্ব্রিজে যে পুঁথিগুলি দিয়াছিলেন, তাহার ক্যাটালগ করিতেছিলেন। তাঁহার ক্যাটালগ ১৮৮৩ সালে বাহির হয়। ক্যাটালগ বাহির করার পরই তিনি একবার ভারতবর্ষে আসেন এবং নেপাল বেড়াইয়া যান। তিনি কলিকাতা আসিলে আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয়।

আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম যে, এই যে এত বড় বৌদ্ধধর্ম্ম, যাহা বাঙ্গালা বেহার হইতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাঙ্গালায় তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি চলিয়া গেলে আমি মনে মনে স্থির করি, বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালায় কি রাখিয়া গিয়াছে খোঁজ করিতে হইবে। এমনি দেখিলে ত' বোধহয় কিছুই রাখিয়া যায় নাই। বেহারে তবু ভাঙ্গা বাড়ীগুলি আছে, বাঙ্গালায় তাও নাই। এই সময় বঙ্গবাসীর যোগেনবাবু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশ করেন। সে বইখানা পড়িয়া মনে হয় যে ধর্ম্ম-পূজাই হয় ত' বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থা। ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উপর, তাঁর পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্ম্মমঙ্গলের সম্বন্ধ বড় বেশী নাই। তখন ধর্ম্মঠাকুরের পূজা দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়।

পাটুলির নিকট শুঁয়াগাছি গ্রামে এক ময়রার বাড়ী ধর্ম্মঠাকুর আছেন শুনিয়া দেখিতে যাই। ঠাকুর খুব জাগ্রত, তাঁর কাছে মানৎ করিলে সব রকম পেটের অসুখ আরাম হয়। রথের মতন থাক্ থাক্ করা এক সিংহাসন, তাহার উপর ঠাকুর আছেন। ঠাকুর একখানি কাল পাথর বলিয়া মনে হইল, পাথরে যেন পিতলের paper-fastener বসান আছে, সেগুলি ঠাকুরের চোখ। ভক্তিভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কিছু পূজা দিয়া ময়রাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাপু, তুমি কি মন্ত্রে ঠাকুর পূজা করিয়া

থাক ও ঠাকুরের ধ্যান কি ?' অনেক পীড়াপীড়ির পর সে ধ্যানের মন্ত্রটি বলিল ; মন্ত্রটি এই—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণং নাস্তিকায়নিনাদং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম ব যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
তত্ত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু নঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥

আবার শুনিলাম মুকুসিমপাড়ার কাছে জামালপুরে এক ধর্ম্মঠাকুর আছেন। তিনি বড় জাগ্রত, যে যা মানৎ করে, সে তাহা পায়। ঠাকুর বড় রাগী, কোনরূপ ক্রটি হইলে হঠাৎ মন্দ করিয়া বসেন। তিনি চালাঘরে থাকিতে ভালবাসেন, কেহ কোঠাঘর করিয়া দিতে চাহিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। তিনি যেখানে বসিয়া আছেন, তাহার মাথার উপর চালে খড় কখনই থাকে না। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন তাঁহার ওখানে মেলা হয়, সে মেলায় ১০০০।১২০০ পাঁঠা পড়ে, অনেক শূয়ার ও মুর্গীও পড়ে। আগে সামনেই শূয়ার মুর্গী বলি হইত, এখন মন্দিরের পিছন দিকে হয়। এই সকল শুনিয়া জামালপুরের ধর্ম্মঠাকুর দেখিবার জন্ম বড়ই আগ্রহ হইল। জামালপুর গেলাম ; গিয়া দেখি সামনের দাওয়ার চালে অসংখ্য ঢিল ঝুলিতেছে ; ন্যাকড়ার ফালি, কাপড়ের পাড়, পাটের দড়ী, শণের দড়ী, নারিকেল দড়ী প্রভৃতিতে ঢিল ঝোলান আছে। কেহ কিছু মানৎ করিলে, একটি ঢিল ঝুলাইয়া আসে এবং মনোরথ পূর্ণ হইলে ঢিলটি খুলিয়া লয়। আমি অনেকক্ষণ মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম ; আমার বোধ হইল মন্দিরের পিছনে একটা স্তূপ ছিল— তাহার গোল তলাটা মাত্র পড়িয়া আছে। তলা একেবারে মাটির সমান। মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড মনসাসিজের গাছ, গাছের দুটা ডালের মধ্যে একখানে একটু পালিসকরা পাথর। সিজগাছের দুটা ডালের মাঝখানে পাথরখানা অনেক দিন আগে রাখা হইয়াছিল— তারপর ডাল বাড়িয়া উঠিয়াছে—দু'দিক হইতে পাথরখানাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। অনেক টানিয়া পাথরখানা বাহির করিলাম—দেখিলাম উহাতে একটি বড় কারিকুরি করা W লেখা আছে। এইরূপ Wই প্রায় ১০০৭

বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ত্রিরত্নের চিহ্ন ছিল। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড গাছ,—অশ্বত্থ কি বট মনে নাই—গাছের তলায় বিস্তর আস্‌শেওড়ার গাছ। আস্‌শেওড়ার বনের মধ্যে একখানা পাথর পড়িয়া আছে। পাথরখানা তুলিয়া লইয়া দেখিলাম উহাতে একটি নাগকন্যার মূর্ত্তি। কন্যার মাথার উপরে কয়েকটি নাগ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। ইহাকে মনসার মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে।

আমি থাকিতে থাকিতেই একজন জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিলেন। আমি দেখিলাম একটি মাটির বেদীর উপর একখানি পাথর বসান। উল্কার পাথরের মত উহা চক্‌চক্ করিতেছে। ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া আমি ঠাকুরের কাছে কোষাকুষি লইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলাম এবং এই সুযোগে ঘরের সব জিনিস দেখিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণ সিকা হইতে একটি বড় হাঁড়ী পাড়িলেন, তাহা হইতে প্রায় সেরখানেক চাল বাহির করিলেন এবং ধুইয়া একখানা বড় থালে রাখিলেন। এটি তাঁর নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের চারিদিকে কিছু কিছু উপকরণ রাখিলেন। পরে আঙ্গুল দিয়া নৈবেদ্যটি দুই ভাগ করিয়া কাটিলেন; এইরূপ কাটায় নৈবেদ্যের মাথাটিও দুই ভাগে কাটিয়া গেল—তখন তিনি সেই দুই মাথায় দুটি সন্দেশ বসাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ও কি করিলেন? নৈবেদ্য দু'ভাগে কাটিলেন কেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ইনি ধর্ম্মঠাকুরও বটেন শিবও বটেন। তাই এক নৈবেদ্য দুই করা হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মন্ত্রে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন?" তিনি বলিলেন, "শিবায় ধর্ম্মরাজায় নমঃ।" আমি তাঁহাকে ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যান পড়িতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি জানি না, যাঁর ঠাকুর তিনি জানেন, তিনি এখন এখানে নাই, আমার উপর ভার দিয়া গিয়াছেন,—আমি যাহা জানি তাহাতেই পূজা করি।"

শুনিলাম ঠাকুর একজন গোয়ালার ছিলেন। সেই পূজা অর্চ্চা করিত, কিন্তু ঠাকুর যখন খুব জাগ্রত হইয়া উঠিলেন তখন ব্রাহ্মণেরাও মানৎ করিতে লাগিল। চারিদিকেই বড় বড় ব্রাহ্মণের গ্রাম; ব্রাহ্মণেরা গোয়ালার হাতে ঠাকুরের পূজা দিতে ইতস্ততঃ করে দেখিয়া, গোয়ালা একজন দুর্দ্দশাপন্ন

ব্রাহ্মণকে পূজারি নিযুক্ত করিলেন। সে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণেরই পূজা দিত, পরে অন্য জাতেরও পূজা দিতে লাগিল। কিন্তু শূয়ার ও মুর্গী বলির সময় সে আসিত না, মানৎওয়ালারা ছোট জাতের পণ্ডিত লইয়া আসিত। ক্রমে গোয়ালার বংশ লোপ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠিল, এখন ঠাকুর তাঁদেরই—তাঁহারা সব হিন্দুর আচার-ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি উহা ইংরাজী ৯৩ কি ৯৪ সালে। ৯৮ কি ৯৯ সালে আমি আর একবার যাই। সেবার দেখি ধর্ম্মঠাকুর মাটির বেদীতে আর নাই। তাঁহার নীচে বেশ একটি পরিষ্কার বড় গৌরীপট্ট হইয়াছে।

ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে শুনিলাম কলিকাতা সহরের মধ্যেই অনেক স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে। তাহার মধ্যে ৪৫ নং জানবাজার রোডের ধর্ম্মঠাকুর খুব প্রবল। তাঁহার একটি একতলা মন্দির আছে; মন্দিরের সামনে বারান্দা আছে; বারান্দার নীচে উঠান আছে; উঠানের পর রেলিং আছে। সিংহাসনখানি অনেক থাকের উপর। ধর্ম্মঠাকুরের আসন সকলের উপর। তাঁহার নিচে থাকে গণেশ ও পঞ্চানন্দ। গণেশ ও পঞ্চানন্দের নীচে তিনখানি পাথর, মাঝের খানি একটু ছোট, বোধ হয় ত্রিরত্নের মূর্ত্তি। এই তিনখানির নীচে থকে শীতলা ও ষষ্ঠী, আর ঘরের কোণে জ্বরাসুর—প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ত্রিপদ ও ত্রিশির। ধর্ম্মঠাকুরের চোখ আছে, এবং সেই তিনখানি পাথরেরও চোখ আছে। ধর্ম্মঠাকুরের মানৎ করিলে অনেকে পাঁঠাও দেয়, কিন্তু পাঁঠাবলির সময় ধর্ম্মঠাকুরের সামনের কপাটখানি বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, কারণ ধর্ম্মঠাকুর পরম বৈষ্ণব, মাংস খানও না প্রাণী-হিংসাও চান না। কিন্তু পঞ্চানন্দ বড় মাংসাশী—তিনি যেমন মাংস খান তেমনি মদও খান। তালতলা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দে এই ধর্ম্মঠাকুরের মানৎ করিয়া আপন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তিনিই ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরের মেরামত করিয়া দিয়াছেন, সৌষ্ঠব করিয়া দিয়াছেন। পূজা আদির ব্যবস্থাও তিনিই করেন। ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজারি একজন বর্ণব্রাহ্মণ। বসন্তের চিকিৎসা ও শীতলার পূজা করিয়া তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। হরিমোহনবাবুই আমাকে তন্ন

তন্ন করিয়া মন্দিরটি দেখাইয়াছিলেন। পঞ্চানন্দের মদ্য পান ও মাংস আহারের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, ধর্ম্মঠাকুর যে কেন এ মাতালটাকে সঙ্গে রাখেন জানি না। ওটার কিন্তু ক্ষমতা খুব—যে যা ধরে সে তাই পায়। কিন্তু ওটা মাতালের একশেষ। একদিন একটু মদ কম দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন হতে আর ওকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিকটস্থ সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা গেল, কিছুতেই পাওয়া গেল না। অনেকে পঞ্চানন্দের পূজা না হওয়ায়, নিজের আহারাদি বন্ধ করিয়া দিল। শেষ একদিন একজনকে স্বপ্ন দিলেন, 'আমি জানবাজারের চৌমাথায় শুঁড়ীর দোকানের একটা মদের জালার ভিতরে পড়ে আছি।' তখন ঢাকঢোল বাজাইয়া জালার ভিতর হইতে তাঁহাকে বাহির করা হইল। মহাসমারোহে তাঁহাকে আবার ধর্ম্মমন্দিরে স্থান দেওয়া হইল। হরিমোহনবাবু গদ্গদভাবে বলিলেন, 'সেইদিন হইতে মহাশয়, আমি ওঁর জন্য রোজ এক বোতল মদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, যেন আর না পালায়'। হরিমোহনবাবুর গদ্গদ ভাব দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

বলরাম দের ষ্ট্রীটেও একটি ধর্ম্মঠাকুর আছেন। কিন্তু সেখানে শীতলাই প্রবল। একটু বিশেষ মন দিয়া না খুঁজিলে ধর্ম্মঠাকুরকে দেখিতেই পাওয়া যায় না।

এইরূপ নানা যায়গায় ধর্ম্মঠাকুরের নানা মন্দির দেখিয়া ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধধর্ম্মেরই অবশেষ তাহা আমার বেশ বিশ্বাস হইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইলে ত' হয় না। অন্যকে ত' বোঝান চাই। সুতরাং আমি আমার সুযোগ্য ভ্রমণকারী পণ্ডিত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ দুইজনকেই যে যে স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের বড় বড় মন্দির আছে, সেই সেই স্থানে পুঁথি খোঁজার জন্য পাঠাইয়া দিই। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিই, 'যদি হাকন্দ পুরাণ পাও বা ময়ুরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল পাও, অতি অবশ্য করিয়া লইয়া আসিবে; এবং কোন প্রসিদ্ধ মন্দির দেখিলে মন্দিরের ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ লিখিয়া আনিবে।' রাখালচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শলপ নামক স্থানে গিয়া দেখেন যে ধর্ম্মের মন্দিরে রীতিমত ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্ত্তি রহিয়াছে। বিনোদবিহারী ময়নায় যাইয়া খবর দেন যে ধর্ম্মের মন্দিরে

পূর্ব্বে তিনটি জিনিস ছিল। একখানি পাথর, একটি শঙ্খ ও ধর্ম্মঠাকুর। পাথরটি আর পাওয়া যায় না, শঙ্খটিও আর দেখা যায় না—কেবল ধর্ম্মঠাকুরই আছেন; ধর্ম্মঠাকুর দেখিতে কচ্ছপের মত। ইহার পর শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন—উহার নাম "ধর্ম্ম-পূজাবিধি"। আমার এখনকার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ পুস্তকখানি ছাপাইতেছেন। পুস্তকখানি পড়িলেই বেশ বুঝা যাইবে ধর্ম্মঠাকুর শিবও নন, বিষ্ণুও নন, ব্রহ্মাও নন, কারণ ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ইঁহাদের ধ্যান, পূজা ও নমস্কারাদির ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে। ধর্ম্মঠাকুর ইঁহাদের ছাড়া; ইঁহাদের চেয়ে বড়। ধর্ম্মঠাকুরের শক্তির নাম কামিন্তা। বল্লুকানদীর তীরে ইঁহার প্রথম আবির্ভাব হয়। 'আমি বল্লুকানদীর তীরে বড়ওয়ান গ্রামে এই ধর্ম্ম-ঠাকুরের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এককালে ধর্ম্মঠাকুরের খুব বড় মন্দির ছিল। ভাঙ্গা মন্দিরের চিহ্ন এখনও অনেক জায়গায় অছে। এখনকার মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড একতলা ঘর; সামনে একটি বড় নাটমন্দির। মন্দিরের অধিকারী একজন স্ত্রীলোক, মুখী পণ্ডিত, সাধুভাষায় নাম মোক্ষদা। তিনি জাতিতে ডোম—নিজেই পূজা করেন; তবে পাল-পার্ব্বণে একজন ব্যাকরণজানা ডোমের পণ্ডিত লইয়া আসেন। তিনিও "যস্যান্তো নাদিমধ্যো" ইত্যাদি মন্ত্রে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি কচ্ছপের ন্যায়। এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। বুদ্ধ বলিতে শাক্যসিংহ বুঝাইত, ধর্ম্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত এবং সঙ্ঘ বলিতে ভিক্ষুমণ্ডলী বুঝাইত। কোন কোন সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্ম্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদের মতে ত্রিরত্ন হইত 'ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ।' ক্রমে ধর্ম্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানী বুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই

সকল ধ্যানী বুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানী বুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইতে লাগিল। পূর্ব্বের কুলুঙ্গীতে অক্ষোভ্য বসিলেন, অশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্নসম্ভব, এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি। প্রথম ধ্যানী বুদ্ধ যে বৈরোচন তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপ চারিটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানী বুদ্ধকে এরূপে লুকাইয়া রাখা, লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে আর একটি কুলুঙ্গী করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মত হইল। আমাদের ধর্ম্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং স্তূপ, ধর্ম্ম, এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তির সহিত ধর্ম্মমূর্ত্তির স্তূপ—আর কেহ নহে।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—সঙ্ঘ কোথায় গেল? মহাযানে সঙ্ঘ বোধিসত্ত্ব রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক বোধিসত্ত্বের স্বতন্ত্র পূজা হইত। এখন ভদ্রকল্প চলিতেছে। এ কল্পে অমিভাভের পালা। অমিতাভের বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই জগত উদ্ধার করিতেছেন, তাঁর সহস্র সহস্র নাম, তাঁর সহস্র স্বতন্ত্র মন্দির আছে। স্তূপ হইতে তাঁহাকে এখন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে—ত্রিরত্ন এখন আর নাই। মাত্র ধর্ম্মঠাকুর আছেন। ঐ যে বিনোদবিহারী বলিয়াছেন যে ময়নায় পূর্ব্বে একখানি পাথর, ধর্ম্মঠাকুর ও শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। পাথর লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ ত্রিরত্নের বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন। শঙ্খও নাই অর্থাৎ সঙ্ঘও নাই। আছেন কেবল ধর্ম্মঠাকুর—কচ্ছপাকৃতি।

নেপালে প্রত্যেক বিহারে ফটকের কাছে দেখিবে, এক একটি হারীতির মন্দির। হারীতিই বসন্তের দেবতা, আমাদের দেশের শীতলা। বিহারবাসী বৌদ্ধভিক্ষুরা শীতলাকে বড় ভয় করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা হারীতিকে পূজা না দিয়া, বিহারে প্রবেশ করিতেন না। আমাদের এখানেও

ধৰ্ম্মঠাকুরের সহিত শীতলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ধৰ্ম্মঠাকুরের মন্দির সেইখানেই প্রায় শীতলা।

গণেশ ও মহাকাল নেপালে বুদ্ধমন্দিরের দ্বার-দেবতা। যেখানে বুদ্ধের মন্দির, মন্দিরের মধ্যে ছোট চৈত্যই থাকুক বা শাক্যসিংহের মূর্ত্তিই থাকুক—দ্বারের একদিকে গণেশ, একদিকে মহাকাল। নেপালে দু'জনেই মাংসাশী, দু'জনেই মাতাল। বাঙ্গালায় মহাকালের জায়গায় পঞ্চানন্দ হইয়াছেন। বাঙ্গালায় গণেশ মাংস খান না, কিন্তু পঞ্চানন্দ বড় মাংসাশী। হরিমোহনবাবু পঞ্চানন্দের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তার পর ধৰ্ম্মঠাকুরের চোখ। এখন ত লোকে Paper-fastener দিয়া ধৰ্ম্মঠাকুর ও শীতলার চোখ তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্তু চোখ স্তূপের একটা অঙ্গ। স্তূপের গোল শেষ হইয়া গেলে তাহার উপর একটা চৌকা জিনিস থাকে। তাহার চারিদিকেই দুইটা করিয়া চোখ থাকে। তথাগত প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার চারিটি দিক অবলোকন করিতেন। তিনি চক্ষু হইতে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়া ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর অন্ত পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেন। সেইজন্য এই ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর নাম অবলোকিত। সুতরাং স্তূপের গোলার্দ্ধের উপর চারিদিকে চার জোড়া চোখ থাকাই উচিত। এখনকার ধৰ্ম্মঠাকুরেরও সেইজন্য অনেক চক্ষু। ইহাতেও ধৰ্ম্মঠাকুরকে পুরাণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ বলিয়া মনে হয়।

আমরা শাক্যসিংহের মতাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে কি বলিত? তাহারা আপনাদিগকে সদ্ধর্ম্মী বলিত এবং আপনাদের ধৰ্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম বলিত। অনেক জায়গায় দ ও ধ য়ের যে সংযুক্ত বর্ণ তাহার পরিবর্ত্তে শুধু ধ বলিত। অশোকের শিলালিপিতে বৌদ্ধ-ধৰ্ম্মের নাম সধৰ্ম্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম সধৰ্ম্ম। রামাই পণ্ডিত ধৰ্ম্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনের উষ্মা নামে যে ছড়া লিখিয়াছেন তাহাতেও ধৰ্ম্মঠাকুরের পূজকদিগকে সধৰ্ম্মী বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতও মনে করিতেন যে, ধৰ্ম্মঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধধৰ্ম্ম এক। ছড়াটি পরে দেওয়া

গেল। এ ছড়া পড়িলে আরও বোধ হইবে যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মণবিরোধী ধর্ম্ম। কারণ ছড়ায় বলিতেছে "ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অত্যাচার করাতেই সধর্ম্মীরা ধর্ম্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে আপনি আমাদের আপদ উদ্ধার করুন। ধর্ম্মঠাকুর অমনি মুসলমান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জব্দ করিয়া দিলেন।"

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা

জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘর বেদি
বেদি লয় কর লয় দূন।
দক্ষিণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহি পায়
শাঁপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাইর দিশ পাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড় দশবিশ হইয়া জোড়
সধর্ম্মীকে করএ বিনাশ॥
বেদে করে উচ্চারণ বেরয়ায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সবে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমাবিনে কে করে পরিত্রাণ॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে ছিষ্টি সংহারণ
এ বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপি
হাতে শোভে তীরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥

নিরঞ্জন নিরাকার হইল্যা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেন দম্মাদার।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হইলা মহাম্মদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম্ফ হইলা শূলপানি।
গণেশ হইল গাজি কার্ত্তিক হইল কাজী
ফকির হইল যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদা হইল্যা সেক
পুরন্দর হইলা মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা॥
আপুনি চণ্ডিকাদেবী তিঁহ হইল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হইল বিবিনূর।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়া কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাই পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল॥

উড়িষ্যার জঙ্গলে

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথায় গেল খুঁজিতে খুঁজিতে বাঙ্গালায় ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ বলিয়া বোধ হইল, তখন উড়িষ্যার জঙ্গলে আবার খোঁজ আরম্ভ হইল; যদি সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কিছু কিছু আছে এরূপ প্রত্যাশা করিবার একটা কারণ এই যে, উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে একটি মহলের নাম বোধ অর্থাৎ বৌদ্ধ। সেখানে এখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটা কারণ এই যে, গড়জাত ও কিল্লাজাত মহলের অনেক জায়গায়—এমন কি মোগলবন্দীতেও পুরী ও কটক জেলার অনেক থানায় সরাকি নামে এক জাত তাঁতি বাস করে। তাহাদের বিবাহাদি শুভকার্য্যে এখনও বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। সরাকি তাঁতি বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলাতেও আছে, কিন্তু তাহারা একেবারে হিন্দু হইয়া গিয়াছে—তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্মে এখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গন্ধও নাই। 'সরাকি' শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে দেখা যায় যে উহা 'শ্রাবক' শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং সরাকিরা যে এককালে বৌদ্ধ ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উড়িষ্যায় উহারা এখনও অনেকটা বৌদ্ধ।

মুসলমানদের হাতে বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম নষ্ট হয়। উড়িষ্যাতে ত সে সময় মুসলমানেরা যাইতে পারে নাই। উড়িয়ারা আর চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। সুতরাং বাঙ্গালায় যে ভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম লোপ হইয়াছিল উড়িষ্যায় সেভাবে হয় নাই। বিশেষ উড়িষ্যার জগন্নাথদেব নিজেই বুদ্ধমূর্ত্তি। এখন তিনি নারায়ণের অবতার হইলেও নবম অবতার অর্থাৎ বুদ্ধ অবতার। চূড়ামণি দাস চৈতন্য-চরিত লিখিতে গিয়া জগন্নাথদেবকে বুদ্ধ অবতারই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বাহির করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি দিনকতক বিনা বেতনে ময়ূরভঞ্জের আর্কিওলজিকেল্ সর্ভেয়র হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেক লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে হইয়াছিল। তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারেন যে সেখানে এখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

অনেক স্থানে চলে। তিনি এই ধর্ম্মের অনেক উড়িয়া পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

কিন্তু নগেনবাবুর সব কথা বুঝিতে হইলে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম কতদিন হইতে চলিতেছিল ও ঐ ধর্ম্ম সেখানে কিরূপ গোড়া গাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহার কতক কতক জানা আবশ্যক। তাই আগে একটু পুরাণ কথা আলোচনা করিব, পরে নগেন্দ্রবাবুর কথা বলিব।

অশোকেরও পূর্ব্বে উড়িষ্যাদেশে বিশেষ ভুবনেশ্বরের চারিপাশে বৌদ্ধধর্ম্ম বেশ প্রবল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। স্পুনর (Spooner) সাহেব একবার আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া লেখা তালপাতা দেখিতে দিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া এবং উদয়গিরির দু'একখানি লেখা পড়িয়া মনে হয় ঐর নামে একজন রাজা অশোকের অনেক পূর্ব্বে মগধের হস্ত হইতে উড়িষ্যার উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনেক মঠ ও গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকরাজা উড়িষ্যা জয় করেন এবং তথায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের খুব শ্রীবৃদ্ধি করেন। এখানে বলিয়া রাখি যে উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ প্রায় একই দেশ। কটক ও পুরী জেলা কলিঙ্গও বটে উড়িষ্যাও বটে। কিন্তু বালেশ্বরকে কখনও কলিঙ্গ বলে কি না জানি না। অশোকের সময় কলিঙ্গের রাজধানী ছিল তোষলি। জায়গাটা অনেকদিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন পাওয়া গিয়াছে—উহার এখনকার নাম 'ধৌলি', তোষলি শব্দেরই অপভ্রংশ। অশোকের তোষলি হইতে এখনকার ধৌলি এক মাইলের মধ্যে, দেখা যায়। অশোকের তোষলিতে একটি পাহাড়ের মাথা ছাঁটিয়া তথায় একটি হাতীর মূর্ত্তি বাহির করা হইয়াছে। হাতীর মাথা আছে, শুঁড় আছে, সামনের দুটি পা আছে এবং ধড়ের অর্দ্ধেকটা আছে। বাকীটা খুদিয়া বাহির করা হয় নাই। হাতীর সামনে অনেকটা জায়গায় বেশ খাঁজ কাটা আছে। বেশ করিয়া নিপুণ হইয়া সে খাঁজগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় পূর্ব্বে সেখানে একটি কাঠের মন্দির ছিল। হাতীটি তাহার ভিতরে থাকিত। এই মন্দিরের নীচে পাহাড়ের গা বেশ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে অশোকের একটি শিলালেখ আছে। অশোকের অন্যান্য শিলালেখেও যতগুলি আজ্ঞা

(Edict) থাকে এখানেও সেইগুলি আছে। অধিকের মধ্যে একটি নূতন আজ্ঞা আছে—সেটি এই যে শ্রাবণমাসের কোন কোন তিথিতে তোষলির লোকদিগকে এই আজ্ঞাগুলি শুনাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং অশোকের সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। অশোকের পরে উড়িষ্যায় বোধ হয় জৈন-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ উদয়গিরির হাতীগুম্ফায় যে প্রকাণ্ড শিলালেখ পাওয়া যায় সেটি জৈনলেখ। খণ্ডগিরিতেও জৈন-ধর্ম্মের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সেখানে লোপ হয় নাই। হিয়েন-সাং যখন নালন্দায় পড়িতেছিলেন তখন উড়িষ্যার হীনযানীরা মহাযানীদিগকে কাপালিক বলিয়া গালি দিয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হিয়েন-সাংকে বিচার করিবার জন্য উড়িষ্যায় পাঠাইয়াছিলেন।

মহাযান-ধর্ম্মে যখন নানা দেবদেবীর উপাসনা আরম্ভ হইল—অর্থাৎ বজ্রযান-ধর্ম্ম যখন প্রবল হইয়া উঠিল—তখন উড়িষ্যা বজ্রযানের একটি প্রধান কেল্লা হইয়া দাঁড়াইল। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রবারাহীর পূজা প্রকাশ করেন, তিনি বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া যান। উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, মগধ, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁহার মতের খুব আদর ছিল। তাঁহার এক মেয়ে ছিলেন, নাম লক্ষ্মীঙ্করা। তিনিও বজ্রযানমতের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যার তেলি, কায়স্থ প্রভৃতি জাতের লোকেও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। এই সকল পুস্তকেরই তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা আছে এবং তিব্বতী লোকে আদর করিয়া পড়ে।

ইন্দ্রভূতির পর সোমবংশ, কেশরীবংশ, গঙ্গবংশ, গজপতিবংশ ও সর্ব্বশেষে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সময়ে উড়িষ্যায় বৌদ্ধও ছিল, হিন্দুও ছিল। ব্রাহ্মণেরও প্রতিপত্তি ছিল, বিহারবাসী ভিক্ষুদেরও প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু রাজা হিন্দু হওয়ায় এবং রাজসভায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপত্তি অধিক হওয়ায়, এবং মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধের ভেদ করিতে না পারায়, উড়িষ্যা হিন্দুর দেশ বলিয়াই পরিচিত হইত। মগধ ও বাঙ্গালার বৌদ্ধপণ্ডিতেরা লোপ হইয়া যাওয়ায়

উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা অতি হীন ভাবে বাস করিত। নগেন্দ্রবাবু যে সকল পুস্তক আনিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রতাপরুদ্রের সময় ১৫০০ হইতে ১৫৩৩ পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের উপর উড়িষ্যায় অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। বড় বড় বৌদ্ধগণ বাহিরে বৈষ্ণব সাজিয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহাদের মত চলিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা শূন্যপুরুষ মানিতেন। শূন্যপুরুষকেই বিষ্ণু মনে করিয়া পূজা করিতেন। তাঁহারা অলেখ শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। অলেখ অর্থাৎ অরেখ অর্থাৎ কোন দাগ নাই। নিরঞ্জন শব্দও এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে :—

"জয় ধর্ম্ম শ্রীপুরুষোত্তম। অনাদি স্তুতি পরমব্রহ্ম॥
অব্যক্ত পুরুষ নিরাকার হরি। সর্ব্বঘটে অচ্ছু ব্রহ্মরূপ ধরি॥
নাহি রেখ রূপ তোর শ্রীবিষ্ণু পুরুষ। বিষ্ণুর গোচর হইছু প্রকাশ॥
মন নয়ন চিত্ত চেতন নাহি তোর। কর্ম্ম ধর্ম্ম সর্ব্বঠারে সিদ্ধ ন কর॥
মহামূল্য তোর নাম। ওঁকার শব্দ এ যে বেদান্ত আগম।"

(Modern Buddhism—P 41)

আবার

"তোহর রূপ রেখ নাহি। শূন্য পুরুষ শূন্য দেহী॥
বোইলে শূন্য তোর দেহো। আবর নাম থিব কাহেঁ৷॥
শূন্য রে ব্রহ্ম সি না থাহি। সেঠারে নাম থিব রহিঁ॥"

(Modern Buddhism—P. 40)

শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদের কেমন অদ্ভুত মিলন! যিনি শূন্য, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষোত্তম।

অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস ও চৈতন্য দাস—ইঁহারাই এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান কবি। অচ্যুতানন্দ দাস প্রতাপরুদ্রের সময় নীলাচলে বাস করিতেন। বলরাম দাস প্রণব গীতা লেখেন এবং মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া বেদান্তমতে প্রণব গীতার ব্যাখ্যা করেন—তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনবরত গালি দিতে থাকে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রও রাগান্বিত হইয়া বলেন, "তুই শূদ্র, প্রণব উচ্চারণে ও বেদের ব্যাখ্যায় তোর কি অধিকার আছে?"

তাহাতে বলরাম হাসিয়া বলেন, "শ্রীপতি কাহারও নিজস্ব নন্। যে ভক্ত, যে ধার্ম্মিক, তাঁরই তিনি। জগন্নাথে কাহারও একচেটিয়া অধিকার নাই। ব্রাহ্মণেরা কেবল দাম্ভিকতা করিয়া বলিতেছেন জগন্নাথ তাঁহাদেরই। আমি বেদের বচন উদ্ধার করিয়া এসকল কথা প্রমাণ করিতে পারি।" ব্রাহ্মণেরা শুনিয়া আরও রাগিয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "করুক্, করুক্, এখনই করুক্ এখনই করুক্।" রাজাও তাহাতে সায় দিলেন। স্থির হইল, সকলে পরদিন প্রভাতে বলরামের আখড়ায় যাইবে এবং তথায় বিচার হইবে। বলরাম সেদিন ভয়ে আর বাড়ী গেলেন না—বটমূলে আশ্রয় লইলেন। গভীর নিশায় নরহরি আসিয়া বলরামকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাকে ভরসা দিয়া গেলেন। পরদিন রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলে বলরাম বলিলেন, "আপনি নিজে শূদ্রের মুখে বেদের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিয়াছেন, তাই আমি ব্যাখ্যা করিতেছি। আমি জড়, মূঢ়মতি, এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই। আমি বেদ ব্যাখ্যা করিলে আপনি রাগত হইবেন না।" ব্রাহ্মণেরা বলিল, "ও যদি বেদ ব্যাখ্যা করিতে পারে আমরা পরাজয় স্বীকার করিব"। বলরাম বলিলেন, "তবে শুনুন। নিত্য হইতে শূন্যের উৎপত্তি; শূন্য হইতে প্রণবের উৎপত্তি; প্রণব হইতে শব্দের উৎপত্তি; শব্দ হইতে বেদের উৎপত্তি; বেদ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি।" এই কথা শুনিয়া রাজা ও ব্রাহ্মণেরা সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবার প্রতাপরুদ্র রাজার বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছিল। রাজা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধপণ্ডিতদিগকে আনাইয়া চুরির ঠিকানা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা পারিল না, বৌদ্ধেরা পারিল। সুতরাং রাজা বৌদ্ধদিগকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু রাণী তাহাতে ভারি চটিয়া গেলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে কে বড় আবার পরীক্ষা হইল। একটা মুখঢাকা হাঁড়ী সভায় আনা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল এ হাঁড়ীতে কি আছে? তাহার ভিতরে ছিল সাপ। ব্রাহ্মণেরা বলিল, 'মাটি আছে'। ঢাকা খুলিলে মাটিই দেখা গেল। ব্রাহ্মণদের উপর রাজার ভক্তি বাড়িয়া

গেল। তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময় বোধ হয় বলরাম দাসকেও পলাইয়া যাইতে হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব রাজা হইলে বলরাম আবার ফিরিয়া আসিলেন—কারণ মুকুন্দদেব বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে যথেষ্ট আদর করিতেন। মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উর্গা নগরের প্রধান লামা তারানাথ এই সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবস্থা জানিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিলেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন, উড়িষ্যার রাজা তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব বৌদ্ধ এবং তাঁহার রাজত্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল গড়জাত মহলে মহিমাধর্ম্ম নামে এক নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এ ধর্ম্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট মিল আছে। এ ধর্ম্মেও অলেখ পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা আছে। ইহাতেও জাতিভেদ নাই। ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মেও ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। এ ধর্ম্মের প্রধান গুরু ভীমভোই—ইঁহার পূরা নাম ভীমসেন ভোই অরক্ষিতদাস। ধেকানল রাজ্যে জুরন্দাগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন এবং অতি নীচ কন্ধ জাতিতে ইঁহার জন্ম। ইনি ধান ভানিয়া খাইতেন। কিন্তু ভগবানের প্রতি ইঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। একুশ বৎসর বয়সে ইনি মনের দুঃখে ঘড়বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান, এবং আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগে থাকেন। একদিন যাইতে যাইতে তিনি এক কূয়ার মধ্যে পড়িয়া যান। কূয়ার মধ্যে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। নিকটের লোকে তাঁহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি উঠিতে চাহিলেন না। তিনদিনের দিন রাত্রিশেষে ভগবান্ নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া কূয়ার উপর দাঁড়াইলেন এবং ভীমভোইকে ডাকিতে লাগিলেন। "ভীম তুমি উপর দিকে চাহ—দেখ আমি আসিয়াছি।" ভীম অন্ধ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি ভগবান্‌কে দেখিলেন। ভগবানও হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে কূয়া হইতে উঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "যাও, অলেখ ধর্ম্ম প্রচার কর।" ভগবান্ তাঁহাকে একখানি কৌপীন দিলেন এবং বলিয়া

দিলেন, “রান্না ভাত ছাড়া তুমি আর কোন জিনিস ভিক্ষা করিও না, গ্রহণও করিও না।” কৌপীন পরিয়া ভীমভোই যখন ভিক্ষা করিতে গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, “একটা পেটের মত চারুটিখানি ভাত দাও,” তখন গাঁয়ের লোকে সব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভীম যখন ভাত ছাড়া আর কিছু লইবেন না জানিল, তখন “এ লোকটা আমাদের জাত খাইতে আসিয়াছে” এই বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। তিনিও কৌপীন ফেলিয়া কপিলাশের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গেলে শূন্য পুরুষ তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং রাগত হইয়া বলিলেন, “তোমার এখনও সিদ্ধি হয় নাই। নহিলে তুমি মার খাইয়া পলাইয়া আসিবে কেন?” এই বলিয়া তিনি ভীমভোইর হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে একটা মন্দিরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন এবং সে মন্দিরের অন্ধি সন্ধি সব বুজাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, “আমি বাহিরে বসিয়া তিন বার হাততালি দিব, তোমার যদি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ত, তুমি বাহিরে আসিতে পারিবে।” তিন তালির পর ভীম যখন বাহিরে আসিলেন, তখন ভগবান্ বলিলেন, “ভীম তোমার সিদ্ধি হইয়াছে। তুমি জুরন্দাতেই থাক। তোমায় আর কোথাও যাইতে হইবে না। তুমি এখানে বসিয়াই অলেখ ধর্ম্মের কবিতা লেখ।” ইহার পর ভীমভোই ভগবানের আজ্ঞায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার সন্তানাদিও হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি অনেক কবিতা লিখিলেন। তাঁহার প্রধান পুস্তকের নাম ‘কলি ভাগবত’। তাঁহার বহুতর ভজন ও পদাবলী আছে। দশ বার বৎসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভীমভোই একবার সদলবলে জগন্নাথের মন্দির দখল করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে মার খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। যশোমতী মালিকা নামক গ্রন্থে এই ধর্ম্মের সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

তাঁহার মতে যে গৃহত্যাগ করিবে সে,—

সুজাতি যে কুলধর্ম্ম সমস্ত ছাড়িবে।
হোমকর্ম্ম যাগক্রিয়া সকল ত্যজিবে॥

দারা সুত বিত্ত ব্রত ক্রিয়া ত্যাজ্য করি।
কুন্তিপট পিন্ধি শিরে থিবে জটা ধরি॥
জম্বুদ্বীপে মহিমাঙ্ক বীজ ম বুনিবে।
নিজ ব্রহ্ম গুরু পাই আনন্দ লভিবে॥
অনাকার মহিমা নামকু করি শিক্ষা।
নব শূদ্র ঘরে মাগি খেলু থিবে ভিক্ষা॥
তেলি, তন্ত্রী, ভাট, কেরা, রজক, কুলারক।
ব্রহ্ম, ক্ষেত্রী, চণ্ডাল যে আবুরিলা পিক॥
এহি নব জাতি ঘরে ভিক্ষা ন ঘেনিবে।
অশুদ্ধ এ মানে শাস্ত্রে লিখিয়াছি পূর্ব্বে॥
এ মানে অটন্তি অধা জন্তরু জাতকি।
তেণু করি নব শূদ্রে বাছি রখিছন্তি॥
নব শূদ্র অটন্তি প্রভুঙ্ক নিজ দ.স।
তাঙ্ক ঘরে অন্নভিক্ষা ন লগাই দোষ॥
মহাব্রহ্ম তেজরে জে হই যাই ভস্ম।
শূদ্রঘরে ভিক্ষা কলে নাহি তাঙ্কু দুষ্য॥
নব শূদ্রঘরে অন্নভিক্ষাকু ভুজিবে।
নগর বাহারে কাল নিদ্রাকু কাটিবে॥
দিবসরে নিদ্রাকালে কাল করে বাস।
রাত্রে অন্ন ভোজন আহারে হয় দোষ॥
প্রভুঙ্কর ভক্ত যে দিবসে ভুঞ্জি:ব।
রাত্রে উপ.বা.স যমকালুকু জগিবে॥
নিশি উজাগরে রহি ধুনিকি জগিবু।
পঞ্চিশ প্রকৃতি তেবে পাঁস করিবু॥
জপ নাহি তপ নাহি উদাসী ভাবরে।
একা মহিমাকু নাম জপিবু হৃদরে॥

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিনয়পিটকের নিয়মের সহিত এই সকল নিয়মের অনেক মিল আছে। ভেকধারী বৈষ্ণবরা এসকল নিয়ম পালন করে না।

বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা নীচজাতির অন্ন গ্রহণ করে না। নীচজাতির অন্ন মহিমা-ধর্ম্মীর পক্ষে শুদ্ধ। ইহারা কুম্ভ নামক গাছের বাকল পরে, সেইজন্য ইহাদিগকে কুম্ভপটিয়া বলে।

ইহাদের মতে বুদ্ধদের অলেখ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচারের জন্য এবং জগৎ উদ্ধারের জন্য বোধ মহলের গোলাসিংহা নামক স্থানে বাস করেন। জগন্নাথদেব নীলাচল ছাড়িয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কাহার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছেন।" বুদ্ধদেব বলেন, 'আমি অলেখের আজ্ঞায় আসিয়াছি। অলেখই পরাৎপর গুরু। বুদ্ধদেব জগন্নাথকে সমাধিস্থ হইয়া কপিলাশে থাকিতে বলেন। তিনিও বার বৎসর দুধ ও জল খাইয়া কপিলাশে থাকেন। সমাধির অন্তে জগন্নাথ ভীমভোইয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান হন।

ভীমভোই বুদ্ধস্বামীর উদ্দেশে এই গানটি লিখিয়াছিলেন,—

অনাকার অরূপ ব্রহ্ম মূরতি হে
এবে বীজে করিছন্তি ধরিতী হে।
অরূপ পুরুষ রূপবস্তু হইলে
ব্রহ্মাণ্ডকু আইলে,
ভকত হিতকারী করুণা-কৃপাধারী
মায়াসিন্ধু সাগরু এবে উধার করি
কিন্তু প্রাণকু দেই কর ভকতি হে॥ ১॥
অগমিকা পুরুষ নামকু বহি
রক্ষা নিমন্তে মহি
নির্ব্বেদরু প্রকাশ মহিমা দীক্ষা রস
ভজি যেবে পারিব জীব পূর্ব্ব কল্মষ
তেবে পাইব সদগতি মুকতি হে॥ ২॥
অচিহ্ন পুরুষ সে যে চিহ্নিবা দেলে
আপে অতিথি হেলে
অলেখ পদ যেহু লেখিন হোই সেহু
গুণপণে শকতা অটন্তি মহাবাহু

একুইশ ভবনে সেহু নৃপতি হে ॥ ৩ ॥
অকল্পন পুরুষ সে কল্পন কলে
অঙ্গু সর্ব্বে জন মিলে
আজ সে করতাঙ্কু নেত্র রে দেখু দেখু
নিন্দিত করু অচ্ছ ভজু অচ্ছ কাহাকু
এবে মহিমা ধর্ম্ম অচ্ছি নিরিখি হে ॥ ৪ ॥
অক্ষয় পুরুষ ক্ষয় হেবাকু নাহি
একুনহি দুই ব্রহ্মাণ্ডে গুরুবীজে
শিষ্য নাহান্তি কেহি
বঢ়্‌ঢহি মা পনে সর্ব্বে দিন যাউছি হি
গুরুদর্শনে খণ্ডকাল বিপতি হে ॥ ৫ ॥
দেহধারী হইছন্তি মহীমণ্ডলে
এ ঘোর কলিকালে
এবনা একাক্ষর বানাহি বীরবর
বচন সুধাধার মুক্তিদানী পয়র
ভণে ভীম অরক্ষিত করি বিনতি হে ॥ ৬

জাতক ও অবদান

মানুষ যখন বুদ্ধ হন, যখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়; তখন তাঁহার অনেকগুলি অলৌকিক শক্তির উদয় হয়। তাহার মধ্যে পূর্ব্বনিবাসের অনুস্মৃতি একটি। তিনি তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, সৃষ্টির প্রথম হইতে তিনি কতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা তিনি বুদ্ধ হইবার পথে কখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় আমরা বলি তিনি জাতিস্মর হন। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন না তাঁহাদের মতে জাতিস্মর হওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মানেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে "কি ছিলাম, কি করিয়াছিলাম" জানিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হন। তাঁহারা মনে করেন, ধ্যান ধারণা যোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের কথা জানিতে পারেন। কেহ এক জন্ম, কেহ দুই জন্ম, কেহ বা দশ জন্ম বিশ জন্ম পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে পারেন। পুণ্য কর্ম্ম, তীর্থ পর্য্যটন, যোগযাগ সৎকর্ম্ম করিলে হিন্দুরা মনে করেন দশজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়, কোটীজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়। তাই যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন তাঁহারা এই সকল সৎকর্ম্ম করার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

বুদ্ধ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনই দেখিতে পাইতেন। সুতরাং তিনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম যে স্মরণ করিতে পারিতেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন; সেই সকল উপদেশ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য অনেক সময়ে তিনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা দিয়া সেগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা, ইহার নাম জাতক।

জাতকের প্রাদুর্ভাব হীনযানে, পালিভাষায়, অত্যন্ত অধিক। পালিভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে; অর্থাৎ বুদ্ধদেব আপনার ৫৫৫টি পূর্ব্বজন্মের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই যে নম্বর ৫৫৫, ইহা কিন্তু সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে; কেহ বলেন ৫৫০, কেহ বলেন ৫২৫, কেহ বলেন ৫৩৫, কেহ

বলেন ৫১৫। ব্রহ্মদেশে ৫১৫ নম্বরই চলিত, তাহার মধ্যে ১০ খানি বড় আর ৫০৫ খানি ছোট। সংস্কৃতে একখানি জাতকমালা আছে। সেখানি আর্য্য-শূরের প্রণীত; ইহাতে ৩৪টি মাত্র জাতক আছে। এই সংস্কৃত পুস্তক হীনযানের কি মহাযানের বলিতে পারা যায় না। কেন না, হীনযানের লোকেও সংস্কৃতে লিখিত। বসুবন্ধু যখন হীনযান ছিলেন, তখন তিনি অভিধর্ম্ম কোষ নামে একখানি পুস্তক লিখেন, সেখানি সংস্কৃতে। প্রোফেসর কুর্ণ অথবা ভট্টকর্ণ সংস্কৃত জাতকমালা ছাপাইয়াছেন। এই সকল জাতকের মধ্যে কোন্ কোন্টি পালির কোন্ কোন্ নম্বরে পাওয়া যায় তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। ডেনমার্কের প্রোফেসর ফোস্‌বোল পালিজাতকগুলি ছাপাইয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব এই পালিজাতকগুলি বাঙ্গলা করিতেছেন। বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে, কোন্ শিষ্যের কথায়, কি উদ্দেশ্যে, এক একটি জাতক বলিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর তিনি সেই জাতকটির বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিতেছেন।

বুদ্ধদেব যখন নিজে এই গল্পগুলি বলিতেছেন, তখন মনে করিতে হইবে, এই গল্পগুলি তাঁহার পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। তিনি গল্পগুলি আপনার পূর্ব্বজন্মের গল্প বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এগুলি ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সম্পত্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা হইতে খৃঃ পূঃ ছয় শতকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার, মনের ভাব, ধর্ম্মের ভাব, জানিতে পারা যায়।

মহাযানের লোকের কিন্তু, জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এক জাতকমালা ছাড়িয়া দিলে, উহাদের আর জাতকের বই নাই। এই জাতকমালা আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, তখন উহার নাম হয়, বোধিসত্ত্বাবদানমালা। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় জাতকমালার বা বোধিসত্ত্বাবদানমালার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে আর্য্যশূরের লেখা এই পুঁথীখানি মহাযানীরা সঙ্গীতির ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন এবং মঙ্গলাচরণের পর উহাতে "এবং ময়া শ্রুতমেকাস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিজহার" বলিয়া মুখপাত করিয়াছেন; অর্থাৎ আর্য্যশূরের

বহিখানিকে তাঁহারা বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমতঃ একটি নূতন জাতক দিয়া আর্য্যশূরের ৩৪টি জাতকের স্থানে ৩৫টি করিয়া লইয়াছেন। আর্য্যশূরের বহির নাম জাতকমালা; মহাযানের বহির নাম বোধিসত্ত্বাবদান বা বোধিসত্ত্বাবদানমালা। ইহা দেখিলেই বোধ হইবে যে মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উঁহারা জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন। উঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাসঙ্ঘিকের দল, তাঁহারাও জাতকের পরিবর্ত্তে অবদান বলিতেন। মহাসাঙ্ঘিক হইতেই যে মহাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরও অনেকেরই এই বিশ্বাস। মহাসাঙ্ঘিকের যে একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের গল্প আছে, কিন্তু সেগুলির নামও অবদান। অবদান শব্দে সংস্কৃত ভাষায় মহৎকার্য্য বুঝায়। মহাযানের অবদানে শুধু বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের কথা নয়, আরও অনেক মহাপুরুষেরই পূর্ব্বজন্মের কথা আছে। যেমন, অশোকরাজা পূর্ব্বজন্মে কোন বুদ্ধকে একমুষ্টি ধূলা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছেন, তাই আর এক জন্মে তিনি চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং অবদান শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা নয়। মহাযানে অবদানের অনেক পুস্তক আছে। আর্য্যশূরের অবদানশতকে এইরূপ ১০০টি অবদান আছে। দিব্যাবদানমালায় ৩৭টি অবদান আছে। ভদ্রকল্পাবদানে ৩৫টি জাতক আছে। অশোকাবদান দিব্যাবদানমালার একটি অবদান, গদ্যে লেখা; কিন্তু অশোকাবদান নামে পদ্যে লেখা আরও একটি বৃহৎ অবদান আছে। সুগতজন্মাবদান নামে আমরা আরও একখানি অবদান পাইয়াছি। অবদানের শেষ এবং উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা—এখানি খৃঃ ১১ শতকে কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস নামে একজন কবির লেখা। তিনি হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার একজন স্তক্ক নামে বৌদ্ধ বন্ধু ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র যখন রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎকথা প্রভৃতি বড় বড় পুস্তকের বিষয় লইয়া রামায়ণমঞ্জরী, ভারতমঞ্জরী, বৃহৎকথামঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তখন স্তক্ক একদিন আসিয়া বলিলেন, আমাদের অবদানগুলি বড় কট্‌মট ভাষায় লেখা, কতক

গদ্য, কতক পদ্য, কোনটাই সুবোধ নয়। তুমি যদি তোমার ভাষায় এইগুলি কাব্যাকারে লিখিয়া দাও, তবে আমাদের ধর্ম্মের বড় উপকার হয়। তাই ক্ষেমেন্দ্র বোধিসত্ত্বাবদান রচনা করেন। ইহাতে ১০৮টি অবদান আছে। ইহার পুরা পুঁথী বড়ই দুষ্প্রাপ্য। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথীতে ৫১–১০৮ পর্য্যন্ত অবদান আছে; কেম্ব্রিজের পুঁথীতে ৪১—১০৮ অবদান আছে, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত হইতে একখানি পুঁথী আনাইয়াছেন, তাহাতে ১—৪৯টি অবদান আছে। তিনি পুঁথীখানি ছাপাইতেছেন, ডানপাতে সংস্কৃত বামপাতে ভুটিয়া ভাষায় তাহার তর্জ্জমা। তিনি ইহার বাঙ্গলাও করিতেছেন।

আমরা একটি জাতক ও একটি অবদান পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। ১। আর্য্যশূরের জাতকমালার প্রথম ব্যাঘ্রী জাতক। ২। মহাবস্তু অবদানের পুণ্যবন্ত ও তাঁহার বন্ধুদিগের অবদান।

১। এক সময়ে বুদ্ধদেব কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কল্পসূত্র অনুসারে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, কৌতূহলী ও অনলস ছিলেন। সেই জন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা যে সব কলা শিক্ষা করিতে পারেন, সে সকল কলাতেও তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পসার প্রতিপত্তিও খুব ছিল। কিন্তু গার্হস্থ্যে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন শুনিয়া, যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহারাও সন্ন্যাসী হইলেন। অজিত তাঁহার প্রধান শিষ্য হইল। তিনি পাহাড়পর্ব্বত, বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন; অজিত সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। একদিন তিনি পর্ব্বতের গুহায় এক বাঘিণী দেখিলেন। সে এইমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষুধায় কাতর, সতৃষ্ণ নয়নে বাচ্ছার দিকে চাহিতেছে। ব্রাহ্মণপুত্র দেখিলেন বাঘিণী ক্ষুধায় এত কাতর যে, সে বাচ্ছাটিও খাইতে চায়। করুণার সাগর সন্ন্যাসী শিষ্যকে বলিলেন— বাঘিণী দেখিতেছি ক্ষুধায় বাচ্ছাটি খাইয়া ফেলিবে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া যদি উহাকে কোন খাবার আনিয়া দাও, তবে বড়ই ভাল হয়। শিষ্য

চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসী ভাবিলেন,—আমার এ ছার দেহে কি কাজ? আমি ইহার আহার হইনা কেন? এই ভাবিয়া তিনি এক উচা জায়গা হইতে বাঘিনীর সম্মুখে পড়িয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। বাঘিনীও আনন্দের সহিত তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শিষ্য আসিয়া দেখিল, তাঁহার গুরু বাঘিনীর জন্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে আর আর শিষ্যদের এই কথা বলিল। সকলেই মনে করিল, ইনি কোন না কোন জন্মে বুদ্ধ হইবেন।

২। কোন জন্মে ভগবান্ বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল পুণ্যবন্ত। তাঁহার চারিজন বন্ধু ছিল। তাঁহাদের নাম বীর্য্যবন্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত, ও প্রজ্ঞাবন্ত। তাঁহাদের কাহার কি গুণ ছিল, তাহা নামেই প্রকাশ। একবার পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া আপনাদের গুণপরীক্ষার জন্য কাম্পিল্ল যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন, গঙ্গায় প্রকাণ্ড এক বাহাদুরী কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে,—দেখিয়াই বীর্য্যবন্ত জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও কাঠ ডাঙ্গায় তুলিলেন। পরীক্ষায় জানিলেন এটা চন্দনের কাঠ—বিক্রয় করিয়া অনেক টাকাকড়ি পাইলেন ও পাঁচজনে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া অনেক আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

শিল্পবন্ত একদিন এক নগরের প্রান্তে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিলেন। বীণায় সাতটি তন্ত্রী ছিল। বীণার ঝঙ্কারে সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া ঝাঁকিয়া পড়িল। এরূপ বীণা তাহারা আর কখনও শুনে নাই। বাজাইতে বাজাইতে বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু সে এমনি কলাবৎ, ছয় তারেই সাত তারের মত বাজাইতে লাগিল। ক্রমে আরও এক তার ছিঁড়িল। তাহাতেও বাজনার কোন ব্যতিক্রম হইল না। ক্রমে চার তার, তিন তার, দুই তার, শেষে এক তারে দাঁড়াইল। তখনও সপ্ততন্ত্রী বীণার ঝঙ্কার হইতেছে। নগরের লোক তাঁহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিল।

রূপবন্তের রূপ দেখিয়া নগরের এক বেশ্যা মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার বন্ধুগণকে অনেক টাকাকড়ি দিল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি একদিন বাজারে গিয়া দেখিলেন,

এক শেঠের ছেলে এক বেশ্যার সহিত ঝগড়া করিতেছে। ঝগড়ার বিষয় একলক্ষ টাকা। শেঠের ছেলে বেশ্যাটিকে আগের রাত্রিতে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল ও একলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হইয়াছিল। বেশ্যার অন্য লোকের বাড়ী যাইবার কড়ার ছিল, সে সে রাত্রিতে যাইতে পারিল না। সে পরদিন সকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেঠ বলিল তোমায় আমার আর কাজ নাই। রাত্রে স্বপ্নে আমি তোমায় পাইয়াছিলাম আমার কাজ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল যদি স্বপ্নে আমায় পাইয়াছিলে, তবে আমার টাকাটি দাও। এ ঝগড়ার আর মীমাংসা হয় না। দুই দলেই লোক জুটিয়া গেল। শেষে প্রজ্ঞাবন্ত আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন। শেঠকে বলিলেন, তুমি এখনই টাকা লইয়া আইস। সে টাকা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। প্রজ্ঞাবন্ত বলিলেন—একখানি বড় আর্শী লইয়া আইস। আর্শী আনিলে, তিনি বেশ্যাকে বলিলেন—"তুমি ঐ আর্শীর ভিতর হইতে টাকা লও। শেঠজী স্বপ্নে তোমার ছায়ামাত্র পাইয়াছিলেন, তুমিও টাকার ছায়া লও, আসল টাকায় তুমি কি করিয়া হাত দিবে?" বেশ্যার মুখ চূণ। মহানন্দে শেঠ সমস্ত টাকা প্রজ্ঞাবন্তকে পুরস্কার দিল। পাঁচ বন্ধুতে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিলেন।

পুণ্যবন্ত এক রাজবাড়ীর সম্মুখে একদিন বসিয়া আছেন। এমন সময় মন্ত্রিপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুণ্যবন্তের পুণ্যজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজবাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন এবং উহারই এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। রাত্রিতে পুণ্যবন্ত ঘুমাইয়া আছেন, রাজকন্যা আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রক্ষকগণ পুণ্যবন্তকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা অনুসন্ধানে জানিলেন পুণ্যবন্তের কোন দোষই নাই। তিনি কাশীরাজের পুত্র জানিয়া, রাজা মহাশয় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিলেন।

এই পুণ্যবন্তই বুদ্ধদেব, বীর্য্যবন্ত তাঁহার শিষ্য শোনক, শিল্পবন্ত রাষ্ট্রপাল, রূপবন্ত সুরেন্দ্র ও প্রজ্ঞাবন্ত শারিপুত্র।

দলাদলি

ধর্ম্ম হইলেই দলাদলি হয়। সভা হইলেই দলাদলি হয়। পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর মতান্তর হইলেই দলাদলি হয়। দলাদলিটা দোষের কথাও বটে, দোষের কথা নয়ও বটে। দলাদলিতে যখন মূল কাজ পণ্ড হয়, তখন দোষের। যখন মূল কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন গুণের। যখন দলাদলির মীমাংসা করিয়া দিবার লোক থাকে, তখন দলাদলিতে উপকার হয়। যখন মিটাইয়া দিবার লোক থাকে না, তখন উহাতে অপকার হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে যে দলাদলি হইয়াছিল তাহাতে ধর্ম্মের উন্নতিই হইয়াছিল; দুই দলই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরিয়াছিলেন। একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে। তাঁহারা যে সব দেশে গিয়াছিলেন, তাহার অনেক দেশ এখনও বৌদ্ধ আছে। সুতরাং এতবড় একটা বড় দলাদলির ইতিহাসটা কিছু জানা চাই।

প্রথম কথা কি লইয়া দলাদলি হয়? অতি তুচ্ছ কথা! যাহা লইয়া দলাদলি হয়, পালিতে তাহাকে দশবত্থু বলে, সংস্কৃতে দশবস্তু। অর্থাৎ দশটি জিনিস লইয়া দলাদলির সূত্রপাত। যথাঃ—

(১) কপ্পতি, সিঙ্গিলোণ কপ্পো:—অনেক ভিক্ষু শিংয়ের পাত্রে একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা তো ভিক্ষা করিয়া খাইতেন? সব সময়ে তো লুণ দেওয়া ব্যঞ্জন পাইতেন না। আবার সেকালে সকলে সকলের লুণ খাইতেন না। লুণ না দিয়া ব্যঞ্জন রান্না হইত। তাই পরিবেশনও হইত। লোকে লুণ মিশাইয়া খাইত। এখনও অনেক খাঁটি হিন্দুর বাড়ীতে আলুণী ছক্কার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন লুণ দিলেই "এঁটো" হয়। তাই পরিবেশনের সময় আলুণীই পরিবেশন করেন। পাতে লুণ থাকে, সেই লুণ মিশাইয়া লোকে 'এঁটো' করিয়া খায়। এইরূপ ব্যবহার বোধ হয় সেকালেও ছিল। লোকে ভিক্ষুদের রান্না জিনিস দিত, আলুণীই দিত। ভিক্ষুরা একটু লুণ

সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন—তাও রাখিতেন শিংয়ে অর্থাৎ যাহার দাম নাই, কুড়াইয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। তখন ত আর Bone-Mill এর এত দরকার হয় নাই! এই যে সামান্য কথা ইহা লইয়াই ঘোর দলাদলি উপস্থিত হইল। যাঁহারা কড়া ভিক্ষু, তাঁহারা বলিলেন, ভিক্ষুর আবার সঞ্চয়? তাহা হইলে আবার ভিক্ষু রহিল না, গৃহস্থ হইয়া গেল। যাঁহারা তত কড়া ভিক্ষু নন, তাঁহারা বলিলেন, একটু লুণ সঞ্চয় করিলাম তাতে বহিয়া গেল কি? আমরা কি কিছুই সঞ্চয় করি না! আমাদের পাত্র আছে, চীবর আছে, শয়ন আসন এসব তো আমাদের থাকে, একটু লুণ থাকিলেই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল? এই আপত্তির নাম সিঙ্গিলোন কপ্পো।

(২) কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো:—বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, বেলা ঠিক্ দুই প্রহরের পর কোন ভিক্ষু আহার করিতে পারিবে না। ১২টা বাজিবার পূর্ব্বে সকলকেই আহার সারিয়া লইতে হইবে, ১২টা বাজিলে পর আর কেহই আহার করিতে পারিবে না। তাহার পর যদি খাইতে হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে। কিন্তু ইহারা তো ভিক্ষু, ভিক্ষা করিয়া রান্না ভাত আনিয়া তো খাইতে হইবে? একালের মত তো আর স্কুল, কালেজ, আফিস ছিল না, যে ৯টার মধ্যে ভাত চাই! সেকালের লোকে খাইত বেলায়, রাঁধিতও বেলায়। ভিক্ষুরা সেই বেলার রান্না ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাইত। দুপুরের আগে খাইতে হইবে। দুপুরের পর এক গ্রাসও খাইবার হুকুম নাই। সুতরাং অনেকের খাওয়া হইত না, অনেকের আধ-পেটা হইত। তাই তারা মনে করিত, দুই প্রহরের সময় ছায়া যেরূপ থাকে, তাহা হইতে দুই আঙ্গুল ছায়া সরিয়া গেলেও খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, সে কখন হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা দু'প্রহরের পূর্ব্বে খাইতে হইবে, সে আজ্ঞা কি আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি! সুতরাং মতান্তর হইল, দলাদলির একটা কারণ হইল।

(৩) কপ্পতি গামান্তর কপ্পো:—ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, একদিনে দুই গ্রামে যাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোন কোন ভিক্ষু মনে করিতেন, যদি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়, আগে স্বগ্রামে ভিক্ষা কিছু

খাইয়া গেলে দোষ কি? প্রথমতঃ দু'বার খাওয়া দোষ, দ্বিতীয় দোষ আগে স্বগ্রামে খাইয়া, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ গেলে, যে বেচারা নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার রান্না অন্নব্যঞ্জন সব ফেলা যায়। কারণ ভিক্ষুরা তো একবার খাইয়া গিয়া আবার সব জিনিস খাইয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ যাইলে ঘরে খাইয়া যাইতে পারিবে না। কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, এ নিয়ম ঠিক। অন্যে বলিলেন, গ্রামান্তরে যাইতে হইলে যদি পেটে কিছু না থাকে তাহা হইলে যাইতে বড় কষ্ট হয়। সুতরাং কিছু খাইয়া গেলে দোষ কি? এও একটা বিবাদের কারণ।

(৪) কপ্পতি আবাসকপ্পো :—এখানে আবাস শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। এক এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করিতেন। যাঁহারা এক ঘরে বাস করেন তাঁহাদের এক আবাস। আবাস শব্দের অর্থ ঘর। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আবাস শব্দের অর্থ পরগণা বা ডিহি। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গার যত ভিক্ষু থাকিবে, সব এক জায়গায় আসিয়া উপোষথ করিবে। উপোষথ শব্দের অর্থ উপবাস, বাঙ্গলায় যাহাকে উপোষ বলে। সংস্কৃতে দুই এক জায়গায় উপবসথ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইতে উপোষথ হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ক্রমে উ লোপ হইয়া পোষথ বা পোষধ হইয়াছে। জৈন ভাষায় আবার ষ, ধ, লোপ হইয়া শুধু পো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মে একটা পো-শালা আছে, সেখানে সকলে অসিয়া পোষধ ব্রত ধারণ করেন অর্থাৎ উপোষ করিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন। অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এ কয়দিন পোষধের দিন। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন এক আবাসের লোক এক জায়গায় পোষধ করিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলিলেন, এ নিয়ম বড় কড়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে পোষধ করিবে। বৃদ্ধেরা বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেই হইবে। আর সকলে বলিলেন, পৃথক পৃথক হইয়া পোষধ করিলে, উপাসকদিগের সুবিধা হয়, তাহাদের ধর্ম্মকথা শুনাইবার সুবিধা হয়, এবং তাহাতেও ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধেরা বলিলেন, সকলে একত্র বসিয়া উপবাস করিলে,

লুকাইয়া খাইবার সুবিধা হয় না, পৃথক পৃথক উপবাস করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেজন্য আবার ভিক্ষুদের দেখিবার দরকার হয়। সুতরাং ইহা একটা বিবাদের কারণ হইল।

(৫) কপ্পতি অনুমতি কপ্পো :—বৌদ্ধদের সকল কর্ম্মই সঙ্ঘে নির্ব্বাহিত হইত, অর্থাৎ এক বিহারের যত ভিক্ষু সকলে একত্র বসিয়া (ভোট লইয়া) বিহারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সকল ভিক্ষু উপস্থিত না থাকিলে, কোন কোন বিহারের ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদের অনুমতি পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লইতেন। এ বিষয়ে যে মতামতি হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদল বলিবেন, "অনুপস্থিতেরা যে তোমাদের হইয়া মত দিবেন একথা তোমরা কি করিয়া ভাব।" আর একদল বলিবেন, "তাহারা তো উপস্থিত ছিলেন না, আমরা কি করি, কাজ তো ফেলিয়া রাখা যায় না।"

(৬) কপ্পতি অচিন্ন কপ্পো :—গুরু করিয়া গিয়াছেন আমিও করিব। পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ কি? বৃদ্ধেরা বলিবেন, তথাগতের যাহা উপদেশ তাহার তো ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। তোমার গুরু কোথায় কি করিয়া গিয়াছেন, সেটা তো আর তথাগতের উপদেশের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে না। অতএব তোমাকে সে কার্য্যটি ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, বাঃ, বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আমার গুরুও করিয়া গিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে? সুতরাং ইহা লইয়া বিবাদের একটা কারণ হইল।

(৭) কপ্পতি অমথিত কপ্পো :—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুপ্রহরের পর ভিক্ষুরা জল ও ফলরস খাইতে পারিবে। ঘোলটাকে ভিক্ষুরা রস বলিয়াই মনে করিতেন। ঘোল খাওয়ায় তাঁহাদের দোষ ছিল না। দই মওয়া হইলে তবে তো ঘোল হয়! অনেক ভিক্ষু দইয়ে জল দিয়া পাতলা করিয়া তাহাকে ঘোল বলিয়া খাইতেন। এই যে 'আমওয়া' দই এটা ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। অনেক ভিক্ষু বলিলেন, এ নিষেধের কোন মানে নাই। এ জিনিসটা তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে, ঘোলও জল দিয়া তৈয়ারী হয়। একটা 'মওয়া', একটা 'আমওয়া'।

এতে আর এতই তফাং কি? বৃদ্ধেরা বলিলেন, বেশ তফাৎ আছে। একটাতে মাখনটা থাকিয়া যায়, আর একটাতে থাকে না। মাখন তো ফলের রসও নয়, জলও নয়, সুতরাং সেটা তো খাওয়া উচিত নয়। সুতরাং মাখন খাওয়া যা, 'আমওয়া' দই খাওয়াও তা। এ কার্য্যটি এ:কেবারেই করা উচিত নয়। সুতরাং এটাও একটা বিবাদের কারণ।

(৮) কপ্পতি জলোগী কপ্পো:—মদ গাঁজিয়া উঠিবার পূর্ব্বে জল বলিয়া সেইটাকে খাওয়া। অর্থাৎ তাড়ি হইবার পূর্ব্বে ঝাঁঝওয়ালা রস খাওয়া। ইহা লইয়াও দলাদলি হইল। বৃদ্ধেরা বলিলেন, "ওতো মদ। মদ খাওয়া ভিক্ষুদের নিষেধ। সুতরাং মদ হওয়ার পূর্ব্বে উহাকে খাইলে পেটে যাইয়া মদ হইবে।" অপরে বলিলেন, "আমরা তো মদ খাইলাম না, তথাগতের আদেশ তো পালন করিলাম, পেটে যাইয়া মদ হইলে আমরা কি করিব।"

(৯) কপ্পতি অদশকং নিষীদনং:—নিষীদন শব্দের অর্থ আসন। আর দশা শব্দের অর্থ কাপড়ের ছিলে। যে আসনের ছিলে না থাকে, বৌদ্ধদের তাহাতে বসিতে নাই। ছিলেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে যে সুন্দর আসন হয়, তাহাতে বসা ভিক্ষুদের নিষেধ। ভিক্ষুরা অনেকে চা'ন এইরূপ সুন্দর আসনে বসিতে। বৃদ্ধেরা বলেন, তাহাতে ভগবানের যে আজ্ঞা আছে 'উচ্চাসনে বা মহাসনে বসিবে না', সে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। অতএব ছিলাকাটা আসনে বসিতে নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, ছিলা কাটিলাম আর না কাটিলাম তাহাতে কি আসিয়া গেল? আমরা উচ্চাসনেও বসিতেছি না, মহাসনেও বসিতেছি না। তবে আমরা ভগবানের আজ্ঞা কি করিয়া লঙ্ঘন করিলাম।

(১০) কপ্পতি জাতরূপরজতন্তি:—সোণারূপা গ্রহণ করা বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুদের নিষেধ। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোণারূপা লইতেন। কিরূপে লইতেন তাহার উদাহরণ দেখুন। তাঁহারা উপোষথ-শালায় একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিতেন এবং উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্ষাপণ কাহাপন বা কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়া দিত, ভিক্ষুরা সোণারূপা ছুঁইতেন না, কিন্তু আপনাদের লোক

দিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খরচ করিতেন। কার্ষাপণ বলিতে সেকালে চৌকা চৌকা তামার পয়সা বুঝাইত। বৃদ্ধেরা বলিলেন, ইহার দ্বারা বুদ্ধের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। অন্য ভিক্ষুরা বলিলেন, আমরা তো ছুঁইলাম না, কি করিয়া বুদ্ধদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। সুতরাং এটিও বিবাদের কারণ হইল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ঠিক এক শ বৎসর অতীত হইয়া গেলে, বৈশালীর ভিক্ষুরা বিশেষতঃ যাহারা বজ্জী বংশে জন্মিয়াছিল, তাহারা এই দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় যশ নামে একজন ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি প্রথমেই মহাবনবিহারে উপোষথ-শালায় দেখিলেন একটা ধাতুপাত্রে জল রহিয়াছে, উপাসকেরা তাহাতে কাহাপন দিতেছে। তিনি বলিলেন, এটা বড় দোষের কথা। তিনি উপাসকদিগকে বারণ করিয়া দিলেন, তোমরা দিও না। বৈশালীর ভিক্ষুরা খুব চটিয়া গেল। তাহারা নানারূপে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তিনি পলাইয়া কৌশাম্বী গেলেন। এবং সেখান হ'তে পাবা ও অবন্তীতে ভিক্ষুদের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে অহোগঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিলেন। সম্ভূত শোনবাসী অহোগঙ্গ পর্ব্বতে বাস করিতেন। যশ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন। ক্রমে পাবা হইতে ৬০ জন ও অবন্তী হইতে ৮০ জন ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে রেবত সকলের চেয়ে প্রাচীন ও সকলের চেয়ে বিদ্বান। তাঁহাকে এ কথা জানান যাক। তিনি তক্ষশীলার নিকট বাস করিতেন। সহজাতি নামক স্থানে রেবতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রেবত শুনিয়া বলিলেন, এ দশটাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং এই দশটাই উঠিয়া যাওয়া উচিত। বৈশালীর ভিক্ষুরা তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার এক শিষ্যকে বশ করিয়া ফেলিলেন। রেবত তাঁহাদের কথা শুনিলেন না এবং শিষ্যটিকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুরা পাটলীপুত্রের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

সহজাতিতে ১১৯০ হাজার ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রেবত বলিলেন, যাহারা এ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে তাহাদের সম্মুখেই এ বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। অতএব তোমরা বৈশালী চল। সেখানে রেবত দেখিলেন যে লোকে বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতেছে। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন উব্বাহিকা করিয়া ইহার নিষ্পত্তি কর। অর্থাৎ আটজন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহাদের হাতে নিষ্পত্তির ভার দাও। ৮ জন বড় বড় ভিক্ষু বাছিয়া লওয়া হইল। ইহাদের সকলেরই বয়স এক শতের উপর। ইহারা সকলেই তথাগতকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই দশবস্তুর বিরুদ্ধে মত দিলেন। ক্রমেই সে মত প্রচার হইল। যাঁহারা সে মত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল স্থবিরবাদী অথবা থেরাবাদী। যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের নাম হইল মহাসাঙ্ঘিক। এইরূপে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে দশটি সামান্য কথা লইয়া ঝগড়া হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দুই দল হইয়া গেল।

মহাসাঙ্ঘিক মত

বুদ্ধদেব কখন পরিনিবৃত হন, তাহার দিন তারিখ ঠিক নাই। লঙ্কাবাসীরা বলেন তিনি খৃঃ পূঃ ৫৪৩ সালে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বরাবর বলিয়া আসিতেছিলেন যে, এই গণনায় ৬৬ বৎসরের ভুল আছে। তাহার পরে কাণ্টন নগরে চীনদেশে একখানি কাঠের পাটা পাওয়া যায়। উহাতে কতগুলি ফোঁটা দেখা যায়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দিন হইতে বছর বছর ঐ পাটা সিন্দুকের ভিতর হইতে মহাসমারোহে বাহির করিয়া মঠের ভিক্ষুরা উহাতে একটি করিয়া ফোঁটা দিতেন। ফোঁটা গুনিয়া বৎসর ঠিক করিয়া লইতেন। যখন লেখার ব্যবহার অধিক হয় নাই, তখন অনেক লোকে ফোঁটা দিয়া হিসাব রাখিতেন ; আমরাও বাল্যকালে দেখিয়াছি, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ফোঁটা দিয়া ধোপার হিসাব, গোয়ালার হিসাব রাখিত। কাণ্টন নগরে যে পাটা পাওয়া যায়, তাহাতে ৯৭৫টি ফোঁটা ছিল এবং ৪৮৯ খৃঃ সালে শেষ ফোঁটা দেওয়া হয়। সুতরাং ৯৭৫—৪৮৯ = ৪৮৬ খৃঃ পূঃ সালে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। অনেক বাদানুবাদের পর ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ৪৮৩ খৃঃ পূঃ সালেই তাঁহার নির্ব্বাণ হয়।

ইহার পর একশত বৎসর বৌদ্ধদের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে বড় আনন্দে ছিলেন, তাহা নহে ; তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল ছিল। যে দিন বুদ্ধদেব মরেন সেই দিনই সুভদ্র নামে এক ভিক্ষু বলিয়া বসেন, "আঃ বাঁচলাম, কঠোর শাসন হইতে আমাদের উদ্ধার হইল। এখন আমরা যা খুসী করিতে পারিব।" যাহা হউক, স্থবিরেরা একত্র হইয়া রাজগৃহের নিকট সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে এক সঙ্গীতি করিয়া সব গোলযোগ মিটাইয়া দেন ও বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপকে সংঘথের করিয়া ধর্ম্মশাসনের বন্দোবস্ত করেন। তদবধি একজন করিয়া সংঘথের থাকিতেন ; তিনিই বৌদ্ধদের আপীল কোর্ট ছিলেন। কোনও গোলযোগ হইলে সকলে তাঁহার নিকট গিয়া পড়িতেন। তিনি যাহা বলিতেন, কাজ সেইরূপ হইত।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টের ৩৮৩ বৎসর পূর্ব্বে

সর্ব্বকামী সংঘথের ছিলেন। তাঁহার সময়ে "দশবস্তু" লইয়া বৈশালীর বজ্জিপুত্তদের সঙ্গে যে দলাদলি হয়, সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তক্ষশীলা রেবত আসিয়া উব্বাহিকা করিয়া যেরূপে দলাদলি মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সে কথাও বলা হইয়াছে। থেরাবাদীরা বলেন, তাঁহাদের দিকে ১১৯০০০০ ভিক্ষু ছিল, আর বৈশালীওয়ালাদের পক্ষে ১০,০০০ মাত্র। একথা ঠিক বিশ্বাস হয় না। কারণ বৈশালীওয়ালারা নাম লইল "মহাসাঙ্ঘিক"। এত কম হইলে তাহারা কোন সাহসে এত বড় নাম লইবে? আর অশোকের পূর্ব্বে এগার লক্ষ ভিক্ষু থাকাও বড় সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয় সংখ্যায় বিরুদ্ধ দলই বড় ছিল। কিন্তু বয়স, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, পসার-প্রতিপত্তিতে থেরাবাদীরা বড় ছিল। থেরাবাদীদের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। চীনদেশে যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা কনিষ্কের সময় হইতেই বিশ্বাসযোগ্য কারণ তাঁহার সময়ই চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রথম প্রবেশ হয়। খৃঃ পূঃ ৩৮৩ হইতে খৃঃ ৭৮ পর্য্যন্ত মহাসাঙ্ঘিকদের ইতিহাস অন্ধকার। অশোকের রাজত্বের ১৭ বৎসরে পাটলিপুত্রে যে সঙ্গীতি হয় মহাসাঙ্ঘিকেরা তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কনিষ্কের সময় জলন্ধরে যে সঙ্গীতি হয়, থেরাবাদীরা আবার তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাহা হউক দ্বিতীয় সঙ্গীতি ৩৮৩ হইতে অশোকের সঙ্গীতি পর্য্যন্ত মহাসাঙ্ঘিকদের ছয়টা দল হয় ও থেরাবাদীদের ১২টা দল হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ১৮টা দল হইয়া বৌদ্ধেরা একপ্রকার লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। অশোকের অনুগ্রহ পাইয়া থেরাবাদীরা প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসাঙ্ঘিকদের যে কি দশা হইল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহারা বোধ হয় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ইহার পরেই ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে মৌর্য্যরাজাদের বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। যিনি ভাঙ্গিলেন তিনি শুঙ্গ গোত্রের একজন সামবেদী ব্রাহ্মণ। তাহার নাম পুষ্যমিত্র। প্রাচীন পুঁথীতে "ষ্য" ও "ষ্প" প্রায়ই সমান, সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে, তাঁহার নাম পুষ্পমিত্র। তিনি বৌদ্ধদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তিন চারশত বৎসর পরে যেমন রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীশ্চিয়ানদিগের উপর

অত্যাচার হইত, পুষ্পমিত্র সেইরূপ আরম্ভ করিলেন। তিনি বিধর্ম্মী ও সমাজদ্রোহী বলিয়া অনেক বৌদ্ধের প্রাণসংহার করিলেন। বৌদ্ধেরা তাঁহার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিত না, মুখে আনিলে গালি দিত! এ অত্যাচার হইতে মহাসাঙ্ঘিক দল অনেকটা রক্ষা পাইয়াছিলেন। কারণ যাঁহাদের কথায় অশোক যজ্ঞে পশুহত্যা নিষেধ করিয়া সকল ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ সামবেদী ব্রাহ্মণের মনে, দারুণ আঘাত দিয়াছিলেন, তাঁহার রাগটা তাহাদেরই উপর অধিক পরিয়াছিল। এ দিকে আবার থেরাবাদীদের নির্য্যাতনে মহাসঙ্ঘিকেরা কতকটা হিন্দুদের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। বুদ্ধদেব আশী বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, একথা তাঁহারা মনেও করিতে পারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন তিনি কোন অনির্ব্বচনীয় ভাবে আছেন। যতদূর দেখা যাইতেছে তাঁহারাই প্রথমে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিহারে স্থাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুঁথীপাঁজী সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষায় লেখা হইত। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে মহাবস্তু বলিয়া মনে করিতেন। থেরাবাদীরা বিনয়ের কঠোর শাসনে বদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা ত গোড়া হইতেই সে শাসনের কঠোরতা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দিকে অধিক ঢলিয়া পড়িলেন।

থেরাবাদীরা মনে করিতেন বিনয়ের নিয়ম রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে এবং চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাঁহারা অনেক জন্মের পর এমন অবস্থায় আসিয়া পরিবেন যে, মুক্তির পথ হইতে তাঁহাদিগকে আর ফিরিতে হইবে না। এইরূপ অবস্থাকে তাঁহারা স্রোতাপত্তি বলিতেন অর্থাৎ স্রোতে পড়িলে যেমন মানুষ আর ফিরে না ক্রমেই একদিকে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহারাও নির্ব্বাণের দিকে ভাসিয়া যাইবেন। আরও কিছু দিন পরে তাঁহারা এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, তাঁহাদিগকে আর একবারমাত্র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকে তাঁহারা সকৃদাগামী অবস্থা বলিতেন। আরও অগ্রসর হইলে তাঁহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, ইহার নাম অনাগামী অবস্থা। ইহার পর তাঁহারা অর্হৎ হইবেন। কিন্তু তাঁহারা মুক্তি পাইবেন

না, অর্হৎ হইয়া বসিয়া থাকিবেন। আবার নূতন বুদ্ধ আসিলে সেই বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ নিবিয়া যাইবেন। অর্থাৎ আর জন্মগ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা জন্ম জরা মরণের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহারা কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তি হয় ভাবিতেন। মহাসঙ্ঘিকেরা মনে করিতেন বিনয় প্রথম প্রথম কতকটা দরকার হয় বটে কিন্তু যেমন পাটলীপুত্র হইতে কোন বণিক যদি বানিজ্য করিতে যায় সে প্রথম ঘোড়া হাতী উটের পিঠে ও গাড়ীতে মাল চাপাইয়া বরাবর গিয়া তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হয়; সেখানে গিয়া দেখে যে, আর হাতী ঘোড়া উটও চলিবে না গাড়ীও চলিবে না তখন নূতন যানবাহনের প্রয়োজন, এখন নৌকা চাই দাঁড় চাই, হাল চাই পাল চাই—তেমনি চরিত্র-বলে কর্ম্মবলে কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এমন স্থানে উপস্থিত হন, যে কর্ম্ম, চরিত্র, বিনয়ে তাঁহাদের কোনই সাহায্য হয় না তখন জ্ঞান চাই; সে জ্ঞান লাভের উপায় স্বতন্ত্র উপকরণ স্বতন্ত্র।

গোড়ায় কথা উঠিয়াছিল, বুদ্ধদেব লৌকিক, অপর মানুষের মত, না অলৌকিক, যেমন দেবতা? থেরাবাদীরা বলিতেন, তিনি মানুষ, মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিল, না। তিনি অলৌকিক শব্দ ব্যবহার করিতেন না, বলিতেন লোকোত্তর তাই মহাসাঙ্ঘিকদের আর এক নাম হইল লোকোত্তরবাদী। মহাবস্তুতে আছে—অর্য্যমহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তর-বাদিনাং' পাঠেন ইত্যাদি। তাঁহারা বলিতেন বুদ্ধদেবের কোনও আশ্রব ছিল না, অর্থাৎ কোন দোষ ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার অহংবুদ্ধি ছিল না, অজ্ঞান ছিল না, এবং জন্মমৃত্যুর তিনি অতীত ছিলেন। থেরাবাদীরা বলিত প্রথম দুইটি কথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু শেষটি ঠিক হইল কেমন করিয়া? তাহা হইলে তিনি মরিবেন কেন? তিনি যখন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছিলেন তখন মানুষের মত তাঁহার সবই ছিল। নহিলে তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও রাগ হইত, কাহারও ঈর্ষ্যা হইত কাহারও দ্বেষ হইত কেন? সুতরাং তোমার আমার মত তিনি মানুষ ছিলেন, তাঁহার আশ্রবও ছিল। মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব কখনও একটি বৃথা কথা কহেন নাই; তিনি যাহাই বলিতেন, তাহাতেই উপদেশ

পাওয়া যাইত। তিনি নিরন্তরই লোকের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন, লোকের উদ্ধার ছাড়া তাঁহার আর কাজই ছিল না। শোওয়া, বসা, দাঁড়ান ও পায়চারি করা এই চারিটিকে ঈর্য্যাপথ বলে, বুদ্ধদেব যে কোন ঈর্য্যাপথেই থাকুন, তাঁহার দ্বারা লোকের কেবল উপকারই হইত। থেরাবাদী বলিতেন, একথা আদৌ সত্য নহে, তিনি মানুষ ছিলেন, মানুষের মত তাঁহাকে খাওয়া দাওয়া করিতে হইত, পায়চারি করিতে হইত, দাঁতন করিতে হইত, স্নান করিতে হইত। এই সকলের জন্য লোকজনের সহিত কথা কহিতে হইত, হুকুম করিতে হইত। এ সকলের দ্বারা লোক উদ্ধার হইবে কিরূপে? তিনি অযথা কথা কহিতেন না, বাজে কথা কহিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার সকল কথায়ই যে লোক উদ্ধার হইত, এটা বড় বেশী কথা। 'মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেবের ঘুম ছিল না, সুতরাং স্বপ্নও ছিল না। থেরাবাদীরা বলিতেন, স্বপ্ন ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তিনি ত মানুষ, ঘুম ছিল না সে কি কথা? মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব নিরন্তরই সমাধিমগ্ন থাকিতেন, সুতরাং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে ভাবিতে হইত না। তিনি একেবারেই তাহার জবাব দিতে পারিতেন ও দিতেন। থেরাবাদীরা বলিতেন, তাঁহাকেও ভাবিয়া জবাব দিতে হইত।

থেরাবাদীরা বলিত, কৈ, বুদ্ধদেব ত' নিজে কখন বলেন না যে তিনি লোকোত্তর, তবে তোমরা তাঁহাকে "লোকোত্তর লোকোত্তর" বলিয়া গোল কর কেন? তাঁহার মতে যাহা পরমার্থ তাহাই তিনি শিখাইতেন, তিনি ত কখন বলেন নাই যে তিনি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া এই সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, শিষ্যদিগকেও তাহা উপদেশ দিতেন। মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিতেন, সত্য কিন্তু পড় দেখি বুদ্ধের উপদেশ, পড় দেখি তাঁহার সূত্রান্ত, দেখ দেখি তাহাতে কত গভীর ভাব, কত গভীর উপদেশ কত গূঢ় তত্ত্বকথা আছে। সাধারণ মানুষের সাধ্য কি সে সব কথা কয়, সে সব ভাব মনে ধারণা করে, সে সব গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করে। এই সকল কথা লইয়া প্রথম দলাদলি হইতেই বৌদ্ধদের মধ্যে ঝগড়া হইত। শেষ এই সকল কথা হইতেই মহাসাঙ্ঘিক ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

থেরাবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক

সংস্কৃতে নিদান শব্দের অর্থ আদিকারণ, মূলকারণ, একেবারে গোড়া। বৈদ্যেরা রোগের নিদান খোঁজেন অর্থাৎ মূল কারণ খোঁজেন, তাহার পরে চিকিৎসা করেন। আমরাও সংসারযাত্রায় সকল ব্যাপারেরই আদি কি দেখিতে চাই। বৌদ্ধেরা যখন সংসারের মূল খুঁজিতে যান, তখন অবিদ্যা, সংস্কার-বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ এই বারটি সংসারের নিদান বলিয়া দেখেন। যখন বুদ্ধদেবের নিদান খুঁজিতে যান, তখন তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বুদ্ধ হওয়ার জন্য কি কি করিয়াছিলেন, তাহাই খোঁজেন। এই বুদ্ধনিদান সম্বন্ধে থেরাবাদীদের ও মহাসাঙ্ঘিকদের বিশেষ মতান্তর। থেরাবাদীরা চব্বিশটি বই বুদ্ধ মানেন না, ইঁহাদিগের প্রথম হইতেছেন দীপঙ্কর ও শেষ হইতেছেন কাশ্যপ। তাঁহাদিগের নামগুলি এই—১ দীপঙ্কর, ২ কোণ্ডিন্য, ৩ মঙ্গল, ৪ সুমনস, ৫ রেবত, ৬ শোভিত, ৭ অনোমদর্শিন্, ৮ পদ্ম, ৯ নারদ, ১০ পদ্মোত্তর, ১১ সুমেধা, ১২ সুজাত, ১৩ প্রিয়দর্শিন্, ১৪ অর্থদর্শিন্, ১৫ ধর্ম্মদর্শিন্, ১৬ সিদ্ধার্থ, ১৭ তিষ্য, ১৮ পুষ্য, ১৯ বিপশ্বী, ২০ শিখী, ২১ বিশ্বভূ, ২২ ক্রকুচ্ছন্দ, ২৩ কনকমুনি, ২৪ কাশ্যপ। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি যিনি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন, তিনি তিনিই শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান।

দীপঙ্কর তাঁহার এক শিষ্য মেঘ নামে এক বামণের ছেলেকে বলিয়াছিলেন, অনাগত অধ্বা অর্থাৎ ভবিষ্যকালে তুমি শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইবে, কপিলবাস্তু তোমার জন্মভূমি হইবে, শুদ্ধোদন তোমার পিতা হইবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চব্বিশজনের মধ্যে আরও ২।৪ জন, শাক্যমুনি সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া গিয়াছেন। চব্বিশজনের শেষ বুদ্ধ কাশ্যপ বলিয়াছিলেন, হে শিষ্য জ্যোতিপ্পাল, আমার পরেই ভবিষ্যতে তুমি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবে।

এই হইল থেরাবাদমতে শাক্যসিংহের নিদান। এ মতে বুদ্ধ চব্বিশজন

কেন হইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয় সেকালের লোকে, চব্বিশ সংখ্যাটা বড় ভালবাসিত। থেরাবাদীদের ত চব্বিশ জন বুদ্ধ ছিলেন, জৈনদের চব্বিশজন তীর্থঙ্কর, সাংখ্যদের চব্বিশটি তত্ত্ব, কোন কোন পুরাণেও ভগবানের অবতার চব্বিশটি, আমরা যে সকল মুনিদের মত লইয়া চলি, তাঁহাদেরও সংখ্যা চব্বিশ। "চতুর্ব্বিংশতিমুনিমতম্" নামে একখানি প্রাচীন স্মৃতি-সংগ্রহ আছে।

মহাসাঙ্ঘিকদের মতে বুদ্ধনিদান অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে বোধিসত্ত্বগণের চারিপ্রকার চর্য্যা অর্থাৎ আচার আছে। এক এক চর্য্যায় কত শত জন্মজন্মান্তর চলিয়া যায়। থেরাবাদীরা যাহা বলিতেছেন, তাহা শেষ চর্য্যায় শেষ অংশ মাত্র। পূর্ব্ব তিনটি চর্য্যার নামও ইহাতে নাই। চর্য্যা চারিটির নাম—১ প্রকৃতিচর্য্যা, ২ প্রণিধানচর্য্যা, ৩ অনুলোমচর্য্যা, ৪ অনিবর্ত্তনচর্য্যা। প্রকৃতিচর্য্যায় বোধিসত্ত্ব মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, কুলজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিমান্, দশ কুশলকর্ম্মপথের পথিক, লোককে সর্ব্বদাই দান করিতে, পুণ্যকর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন, বুদ্ধদিগের পূজা করেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনও বোধিলাভের জন্য লালায়িত নয়। ইহার পরে প্রণিধানচর্য্যা অর্থাৎ আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে, ইহা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা। এই প্রণিধানচর্য্যায় পাঁচটি অংশ আছে, এক একটির নাম প্রণিধি। প্রথম প্রণিধি—আমি বুদ্ধ হইব। দ্বিতীয় প্রণিধি—আমি বুদ্ধকে অনেক বস্ত্র দান করিলাম। তৃতীয় প্রণিধি—যত কালই যাউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে। চতুর্থ প্রণিধি—বুদ্ধ ও সঙ্ঘের জন্য অনেক গুহা, অনেক বিহার দান করা। পঞ্চম প্রণিধি—জগৎ অনিত্য, এইটি বুঝিতেই হইবে।

ইহার পর তৃতীয়, অনুলোমচর্য্যা। প্রণিধানচর্য্যার অনুলোম যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা এই চর্য্যায়ই করিতে হয়। চতুর্থ—অনিবর্ত্তনচর্য্যা, এই চর্য্যা বোধিলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্ত আর অন্য দিকে ফিরিয়া আসিতে চাহে না,—এই চর্য্যায়ই ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ গ্রামার নহে, ইহার নাম ব্যাখ্যা অথবা ভবিষ্যদ্বাণী। অর্থাৎ কোন বুদ্ধ তাঁহার শিষ্য

বোধিসত্ত্বকে বলিয়া দেন, তুমি ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে বুদ্ধ হইবে। থেরাবাদীদের নিদান এই ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা একপ্রকার শেষ চর্য্যার নিদান।

তবে মহাসাঙ্ঘিকদের নিদান কিরূপ? চারি চর্য্যায় অসংখ্য নিদান। শাক্যসিংহের প্রকৃতিচর্য্যার নিদান অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধ। তখন আমাদের শাক্যমুনি একজন চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দশ কুশলকর্ম্মপথের পথিক হন, বৌদ্ধ ভাষায় দশ কুশলকর্ম্মের গোড়া গাড়েন। প্রণিধান চর্য্যায় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান একজন অতীত শাক্যমুনি বুদ্ধ। আমাদের শাক্যমুনি তখন বণিক্‌শ্রেষ্ঠী ছিলেন, তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও একদিন শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইব, আমারও একদিন কপিলবাস্তু নামে নগর হইবে। অনুলোমচর্য্যায় শাক্যমুনির নিদান সমিতাবী বুদ্ধ। তখন শাক্যমুনি একজন চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। অনিবর্ত্তন চর্য্যায় শাক্যমুনির অনেক নিদান; তন্মধ্যে দীপঙ্কর তাঁহার ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। দীপঙ্করের পরে আরও অনেক বুদ্ধ সেই ব্যাকরণের অনুব্যাকরণ করিয়াছিলেন। বিপশ্বী, ক্রকুচ্ছন্দ, কাশ্যপ শাক্যমুনির ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কাশ্যপ আবার বলিয়াছিলেন, তোমায় আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলাম।

যৌবরাজ্যে অভিষেক থেরাবাদীদের নাই, চব্বিশ জনের অধিক বুদ্ধও নাই, কিন্তু মহাসাঙ্ঘিকদের মতে সহস্র সহস্র বুদ্ধ। মহাবস্তু অবদানের আদিতেই "নিদাননমস্কারাণি সমাপ্তানি" বলিয়া একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফ আছে। প্যারাগ্রাফ বলি কেন? অধ্যায় বলিতে পারি না, অত বড় নয়। সেই প্যারাগ্রাফে যে কয়েকটি নিদানের নাম আছে, তাহাই আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। কিন্তু বই পড়িতে পড়িতে অনেক বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। একটু উদাহরণ দিতেছি। মহাবস্তুর মূল গদ্যে, কিন্তু তাহার আবার মূল পদ্যে বা গাঁথায় আছে, তাহারই কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি।

শাক্যমুনিনামকানামুপস্থিতাস্ত্রিংশকোটয়ো জিনানাং।
অষ্টশতসহস্রাণি দীপঙ্করনামধেয়ানাং॥

ষষ্টিং চ সহস্রাণি প্রদ্যোতনামধেয়ানাং * * * ।
তথা পুষ্পনামকানাং ত্রয়োকোটিয়োবাদিসিংহানাং ॥
অষ্টাদশসহস্রাণি মারধ্বজনামকানাং সুগতানাং ।
যত্র চরে ব্রহ্মচর্য্যং সর্ব্বজ্ঞতামভিলাষায় ॥
পূজয়ি পঞ্চশতানি পদ্মোত্তরনামকানাং সুগতানাং ।
কৌণ্ডিন্যনামকানামপরাণি দ্বিসহস্রাণি ॥
অপরিমিতাসংখ্যেয়া প্রত্যেকজিনান কোটিনযুতাং চ ।
পূজয়ি বুদ্ধসহস্রং জম্বুধ্বজনামধেয়ানাং ॥
চতুরশীতিসহস্রাণি ইন্দ্রধ্বজনামসুগতানাং ।
নবতিং চ সহস্রাণি কাশ্যপসহনামধেয়ানাং ॥
পঞ্চদশবুদ্ধসহস্রাণি প্রতাপনামকানাং সুগতানাং ।
পঞ্চদশ চ সহস্রাণি আদিত্যনামধেয়ানাং ॥
দ্বাষষ্টিং চ শতানি সুগতানামস্তোস্তনামধেয়ানাং ।
চতুঃষষ্টি চ সহস্রাণি সমিতাবিনামধেয়ানাং ॥
এতে চ কোলিতশিরী অন্যে চ দশবলা অপরিমাণা ।
সর্ব্বে অনিত্যতায় সমিতা লোকপ্রাদ্যোতা ॥
যানি চ বলানি কোলিত তেষাং মহাপুরুষ-প্রবরাণাং ।
সর্ব্বে অনিত্যতায় কালং ন উপেন্তি সংখ্যাং চ ॥
জ্ঞাত্বানানিত্যবলং সুদারুণং সংস্কৃতস্য অনন্তরং ।
বীর্য্যারম্ভো যোজিতো অনিত্যবলস্য বিঘাতায় ॥

মহাসাঙ্ঘিকদের সংখ্যাটা খুব লম্বা লম্বা। কথায় কথায় তিন কোটি, চারি কোটি, নব্বই হাজার, বিশ হাজার, চৌরাশি হাজার বুদ্ধের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। গরীব থেরাবাদীদের অত লম্বা-চৌড়া ছিল না। এদিকে যেমন সংখ্যায় লম্বা-চৌড়া, কালের পরিমাণেও মহাসাঙ্ঘিকেরা সেইরূপ লম্বা-চৌড়া। নবনবতিকোটিকল্প মহাযানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহাসাঙ্ঘিকেরাও বড় কম যান না। সমিতাবী নামে একজন বুদ্ধ দেখিলেন, আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে, এককল্প

দুকল্প কোন বুদ্ধ হইবেন না, সহস্র কল্পের পরে বুদ্ধ হইবেন। কিন্তু এত কাল ধরিয়া ত বুদ্ধকার্য্য হওয়া চাই। বুদ্ধ হইবে না; ত, কে করিবে? অতএব আমাকেই থাকিতে হইল। তিনি শত সহস্র কল্প রহিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন সহস্র কল্পের পর বুদ্ধ হইবেন, এখন শত সহস্র কল্প রহিয়া গেলেন! মাঝের ও শতটা যেন কিছুই নয়।

জাপানদেশী সুজুকি সাহেব যে লিখিয়াছেন, অল্পবয়স্ক ভিক্ষুরা বুদ্ধদেব আশী বৎসরে মরিয়া গেলেন বলিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব ত মনে করিলেই এক কল্প দুই কল্প থাকিতে পারিতেন, থাকিলেন না কেন? থেরাবাদীরা বলিলেন, তিনি মরিয়াছেন। অনেক বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, না, তিনি মরেন নাই, মরিবেনও না, তিনি মৃত্যুর ভাণ করিয়াছেন মাত্র। কোন কোন মহাযানের বইয়ে আছে, সমুদ্রের জলবিন্দু বরং গণিয়া উঠা যায়, সুমেরু গুঁড়াইয়া সরিষার মত করিয়া ফেলিলে সে সরিষাও গণিয়া উঠা যায়, কিন্তু শাক্যমুনির বয়স গণিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক, বুদ্ধ-নিদান লইয়া এই দুই দলে যে মতান্তর ছিল, তাহার ব্যাখ্যা করা গেল। আরও অনেক জিনিস লইয়া মতান্তর আছে, পরে দেখা যাইবে। তবে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি, পালি জাতকে বুদ্ধদেবের নিদানের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, মহাবস্তুতে সেগুলি একত্র করিয়া একটা ধারা বাঁধিয়া লেখা আছে। ধারা এই যে, চারি চর্য্যায় যতগুলি নিদান আছে, চর্য্যাক্রমে সেগুলিকে সাজান হইয়াছে। কালের পরিমাণ যতই লম্বা-চৌড়া হউক, সময়ানুসারে সেগুলিকে সাজান হইয়াছে। থেরাবাদীরা 'বুদ্ধায় নমঃ' বলিলেই যথেষ্ট মনে করেন, কিন্তু ইঁহারা গোড়ায়ই আরম্ভ করিলেন, "ওঁ নমঃ শ্রীমহাবুদ্ধায়াতীতানাগত-প্রত্যুৎপন্নেভ্যঃ", অর্থাৎ তাঁহারা এক বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে যত বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, হইবেন ও হইতেছেন, সকল বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছেন। থেরাবাদীরা চব্বিশ ও দুই (শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয়) এই ছাবিশজনেই সন্তুষ্ট কিন্তু মহাসাঙ্ঘিকেরা "ছাব্বিশকোটিনিযুতশতসহস্রে"ও সন্তুষ্ট নহেন!

নিদান-নমস্কারে প্রকৃতিচর্য্যায় ভগবান শাক্যসিংহ একজন মাত্র অর্থাৎ

অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধের নিকটে ধর্ম্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, কিন্তু কেবল সংক্ষেপের জন্য সেখানে একজনের নাম করা হইয়াছে। বহুতর বুদ্ধের নিকটেই তিনি ধর্ম্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বিস্তার করিয়া দেওয়া আছে। যথা ;—

"এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মন্তং মহাকাত্যায়ণমুবাচ। ভগবতা ভো জিনপুত্র সম্যকসংবুদ্ধেন শাক্যমুনিনা প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থা পঞ্চমা ষষ্ঠা সপ্তমাসু, ভূমিষু বর্ত্তমানেন যেষু সম্যকসংবুদ্ধেষু কুশলমবরোপিতং, তেষাং সম্যকসংবুদ্ধানাং, কানি নামানীতি। এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাত্যায়ন আয়ুষ্মন্তং মহাকাশ্যপমুবাচ॥ যেষু ভো ধুতধর্ম্মধরসম্যকসংবুদ্ধেষু, ভগবতা শাক্যবংশপ্রসূতেন কুশলমূলবরোপিতং। তেষাং বিপুলবলবরকীর্ত্তিনাং নামানি শৃণু॥

প্রথমতঃ সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তিঃ, ততঃ সুকীর্ত্তিঃ, লোকাভরণঃ, বিদ্যুৎপ্রভঃ, ইন্দ্রতেজঃ, ব্রহ্মকীর্ত্তিঃ, বসুন্ধরঃ, সুপার্শ্বঃ, অনুপবদ্যঃ, সুজ্যেষ্ঠঃ, স্পষ্টরূপঃ, প্রশস্তগুণরাশিঃ, মেঘস্বরঃ, হেমবর্ণঃ, সুন্দরবর্ণঃ, মৃগরাজঘোষঃ, আশুকারী, ধৃতরাষ্ট্রগতিঃ, লোকাভিলাষিতঃ, জিতশত্রুঃ, সুপূজিতঃ, যশোরাশিঃ, অমিততেজঃ, সূর্য্যগুরুঃ, চন্দ্রভানুঃ, নিশ্চিতার্থঃ, কুসুমগুপ্তঃ, পদ্মাভঃ, প্রভংকরঃ, দীপ্ততেজঃ, সপ্তরাজাঃ, গজদেবঃ, কুঞ্জরগতিঃ, সুঘোষঃ, সমবুদ্ধিঃ, হেমবর্ণলম্বদামঃ, কুসুমদামঃ, রত্নদামঃ, অলংকৃতঃ, বিমুক্তঃ, ঋষভগামী, ঋষভঃ, দেবসিদ্ধিমাত্রঃ, সুপাত্রঃ, সর্ব্ববন্দ্যঃ, রত্নমকুটঃ, চিত্রমকুটঃ, সুমকুটঃ, বরমকুটঃ, চলমকুটঃ, বিমলমকুটঃ, লোকংধরঃ, বিপুলোজ্জঃ, অপরিভিন্নঃ, পুণ্ডরীকনেত্রঃ, সর্ব্বসহঃ, ব্রহ্মগুপ্তঃ, সুব্রহ্ম, অমরদেবঃ, অরিমর্দ্দনঃ, চন্দ্রপদ্মঃ, চন্দ্রাভঃ, চন্দ্রতেজঃ, সুসোমঃ, সমুদ্রবুদ্ধিঃ, রতনশৃঙ্গঃ, সুচন্দ্রদৃষ্টিঃ, হেমক্রোড়ঃ, অভিন্নরাষ্ট্রঃ, অবিক্ষিপ্তাংশঃ, পুরন্দরঃ, পুণ্যদত্তঃ, হলধরঃ, ঋষভনেত্রঃ, বরবাহুঃ, যশোদত্তঃ, কমলাক্ষঃ, দৃষ্টশক্তিঃ, নরপ্রবাহঃ, প্রনষ্টদুঃখঃ, সমদৃষ্টিঃ, দৃঢ়দেবঃ, যশকেতুঃ, চিত্রচ্ছদঃ, চারুচ্ছদঃ, লোকপরিত্রাতা, দুঃখমুক্তঃ, রাষ্ট্রদেবঃ, রুদ্রদেবঃ, ভদ্রগুপ্তঃ, উদাগতঃ, অস্খলিতপ্রবরাগ্রঃ, ধমুনাসং, ধর্ম্মগুপ্তঃ, দেবগুপ্তঃ, শুচিগাত্রঃ, প্রহেতিঃ, প্রথমশতমার্য্যপক্ষস্য॥"

যেখানে একটি ছিল, সেখানে এই ত এক নিশ্বাসে সাতানব্বইটি নাম পাইলাম। গ্রন্থকার কিন্তু ইহাকেই একশত বলিয়াছেন, হয়ত লেখকের দোষে তিনটি নাম পড়িয়া গিয়াছে। আর এক নিশ্বাসে আর একশত নাম আছে। আরও এক নিশ্বাসে প্রায় আরও একশত নাম আছে। ইহাতে ত "অষ্টমাভূমি" শেষ হইল। আবার "নবমাভূমি"তেও এইরূপ। সুতরাং লম্বাহাতে নাম বাড়াইতে মহাসাঙ্ঘিক মহাশয়েরা খুব মজবুত। ইঁহাদের সঙ্গে গরীব থেরাবাদীরা পারিবে কেন? কাজেই ক্রমে তাঁহাদিগকে ভারত ছাড়িতে হইয়াছে!

মানুষ ও রাজা

পৃথিবীর সকল দেশেই, পৃথিবীর উৎপত্তি কিরূপে হইল, মানুষ কিরূপে জন্মাইল, এই দুইটি কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টানেরা বলেন, গোড়ায় এক পরমেশ্বর ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আলো হউক', অমনি আলো হইল। তিনি দেখিলেন, আলো উত্তম হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায়ই সৃষ্টি হইয়াছে। এ কথা লইয়াও আবার গোলমাল আছে। কেহ কেহ বলেন, যাহা ছিল না, তাহাই হইল—অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু হইতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সবই সৃষ্টি হইল।- কেহ কেহ বা বলেন, পরমাণু ছিল, ঈশ্বর তাহাই ভাঙ্গিয়া গড়িয়া জগত সৃষ্টি করিলেন। আমাদের কোন কোন শাস্ত্রে লিখে :—ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব। অমনি তিনি বহু হইয়া গেলেন। কোন কোন শাস্ত্রে বলে : সমস্ত জগৎ 'অপ্রজ্ঞাত', 'অলক্ষণ' ছিল। বিধাতাপুরুষ তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ হইতে এক প্রকাণ্ড অণ্ড উৎপন্ন হইল। অণ্ড দুই ভাগ হইল, এক ভাগে পৃথিবী ও আর এক ভাগে অন্তরীক্ষ হইল। দার্শনিকদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন :—এক হইতেই সব হইয়াছে ; কেহ বা বলেন :—দুইই ছিল, দুই হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।

বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন :—তোমার সে কথায় কাজ কি ? তুমি আপন চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? কোথায় যাইবে ? এই কথাই ভাব। আকাশ কোথা হইতে হইল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল, তাহা ভাবিয়া তোমার দরকার কি ? এমনকি মানুষ কোথা হইতে আসিল, তাহাও তিনি কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যান নাই। মহাসাঙ্ঘিকেরা কিন্তু, মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা বিশেষ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পরে পালিভাষায়ও সে মত প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু মহাসাঙ্ঘিকদের মত যে

অতি পুরাণ, তাহা আমরা পরে দেখাইব। মহাসাঙ্ঘিকেরা বলেন :—অনাদিকাল হইতেই 'সম্বর্ত্ত' (প্রলয়) ও 'বিবর্ত্ত' (সৃষ্টি) চলিতেছে। প্রলয় হইয়া গেলে সমস্ত সত্ত্ব (জীব) 'আভাস্বর' নামে এক স্বর্গে উৎপন্ন হয়। আবার যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি 'সত্ত্ব' 'আভাস্বর' হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। তখন তাঁহারা 'স্বয়ংপ্রভ', 'অন্তরীক্ষচর', 'মনোময়', 'প্রীতিভক্ষ', 'সুখস্থায়ী' ও 'কামচর' থাকেন। তাঁহাদের নিজের শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত হয়, চন্দ্রসূর্য্যের প্রয়োজন থাকে না, আকাশের দরকার হয় না, দিন থাকে না, রাত্রি থাকে না, পক্ষ থাকে না, মাস থাকে না, ঋতু থাকে না, অয়ন থাকে না, বৎসরও থাকে না। তাঁহারা, যখন যেখানে ইচ্ছা, অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়ীঘর সুখ। সুখ-নিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন, সবই ধর্ম্ম।

তাহার পর পৃথিবী উদয় হইল—যেন একটি হ্রদ, জলে পরিপূর্ণ। সে জলের কি রঙ! কি আস্বাদ! মিষ্ট যেন মধু, যেন ক্ষীরের ধারা, যেন ঘৃতের ধারা। কোন কোন জীব একটু লোভে পড়িয়া আঙ্গুলের আগায় সেই মধু তুলিয়া একটু চাকিলেন, ভাল লাগিল; আবার চাকিলেন, ক্রমে খাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরও পাঁচজনে চাকিতে ও খাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা পেট পূরিয়া খাইতে লাগিলেন। এতদিন জীবগণ লঘুকলেবর ছিলেন; খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীর ভারী হইয়া উঠিল, শক্ত হইয়া উঠিল, কর্কশ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের যে গুণগুলি ছিল, সেগুলি ক্রমে লোপ হইল, দেহের জ্যোতি লোপ হইল, শুধু প্রীতি ভক্ষণ করিয়া আর তাঁহাদের চলে না, অন্তরীক্ষে আর তাহারা বেড়াইতে পারে না; সুতরাং চন্দ্রসূর্য্যের দরকার হইল, নক্ষত্রের দরকার হইল, দিন, রাত্রি, মাস, সংবৎসরের দরকার হইল।

পৃথিবীর রস খাইতে খাইতে তাঁহাদের রঙও সেইমত হইয়া গেল। এইরূপে অনেকদিন যায়। যাঁহারা অধিক আহার করেন, তাঁহাদের রঙ

খারাপ হইয়া উঠে ; আর যাঁহারা অল্প আহার করেন, তাঁহাদের রঙ ভাল থাকে। ভাল রঙের লোকে মন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং 'আমি বড়', 'তুমি ছোট' এই মান অভিমান জাগিয়া উঠিল। এতদিন যে ধর্ম্ম তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অভিমানের উদয়ে তাঁহাদের সে ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে সে রসও লোপ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা খান কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভুঁইপটপটি উঠিল—চারিদিকে যেন বেঙের ছাতা ফুটিয়া উঠিল। আহা তাহার কি বর্ণ! কি রঙ! কি গন্ধ! কি আস্বাদ! মিষ্ট যেন মৌচাকের মধু। পৃথিবীর রস অন্তর্ধান হইলে জীবসকল দুঃখে গাহিয়া উঠিলেন—হায় রস! হায় রস!

ক্রমে তাঁহারা ভুঁইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভুঁপটপটির মত তাঁহাদের রঙ হইল। এইরূপে কত কাল-কালান্তর কাটিয়া গেল। যাঁহারা অধিক আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া আসিল ; যাঁহারা অল্প আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ ভাল থাকিল। যাঁহাদের রঙ ভাল, তাঁহারা খারাপ রঙের লোককে অবজ্ঞা করেন। 'আমি বড়,' 'তুমি ছোট' এই মান অভিমান বাড়িয়া উঠিল। ভুঁপটপটির লোপ হইল, তাহার জায়গায় বনলতা জন্মাইল। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রঙ বনলতার মতই হইয়া গেল। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান অভিমান আসিয়া জুটিল, বনলতারও লোপ হইল। এবার আসিলেন শালিধান।

এ ধানের কণা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ। সন্ধ্যায় ধান কাটিলে, সকালে আবার গজাইয়া উঠে, সকালে কাটিলে সন্ধ্যায় আবার গজাইয়া উঠে, এমন নয়, একেবারে ধান পাকিয়া উঠে, চার ঘণ্টায় একেবারে পাকা ধান পাওয়া যায়। এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিল। প্রথম প্রথম সকলেই সকাল সন্ধ্যা দুই বেলা ধান ঝাড়িয়া আনিত। সকাল-সন্ধ্যায়ই খাইত, সঞ্চয়ের নামটিও করিত না ; কিন্তু ক্রমে দু' একজন ভাবিল, দু' বেলায়ই ধান কাটিতে হইবে কেন? এক বেলাতেই দু' বেলার ধান জোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল।

তাহাদের দেখাদেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিল। বরঞ্চ সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এখন আর দু' বেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয় হইতে লাগিল, ক্রমে দুই সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিল। ক্রমে ধানের কণা আর তুষ বাড়িতে লাগিল। আর সকালে ধান কাটিলে সন্ধ্যায় আর গজায় না, সন্ধ্যায় কাটিলে সকালে আর গজায় না।

অন্নরসের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। কতকগুলি জীবের শরীরে পুরুষের চিহ্ন দেখা দিল, কতকগুলি জীবের স্ত্রীচিহ্ন দেখা দিল। তাহারা আবার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল, একদৃষ্টিতে পরস্পারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, ক্রমে দোষ উৎপন্ন হইল। দোষ উৎপন্ন হইলে লোকে লাঠি, ঠেঙা, ঢিল, পাটকেল মারিতে লাগিল, গায়ে ধূলা দিতে লাগিল। দেশে অধর্ম্ম উপস্থিত হইল। অধর্ম্ম উপস্থিত হইল বলিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। এ কি? একটি জীব আর একটি জীবের দোষ উৎপন্ন করাইয়া দেয়—এত বড় অন্যায়। ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নিয়মবিরুদ্ধ। ক্রমে ক্রমে অনেকদিনের পর এ দোষ সহিয়া গেল। লোকে মনে করিল, ইহা ধর্ম্মসম্মত, সমাজসম্মত, সহবতসম্মত। লোকেও প্রথমে ভয়ে ভয়ে একদিন দুইদিন একত্র বাস করিত, এখন মাস, পক্ষ, সংবৎসর একত্র বাস করিতে লাগিল, গৃহকর্ম্ম সকলও স্ত্রীলোকদিগকে করাইতে লাগিল, ক্রমে অধর্ম্মের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কণাওয়ালা, তুষওয়ালা ধানক্ষেত না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলি দুষ্টলোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছাই দিল। যাহা হউক, এখন আমাদের এক কাজ করিতে হইবে। এখন ক্ষেত ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ্দ বাঁধিয়া দিতে হইবে, কাহার কোন্ ক্ষেত, ঠিক করিয়া দিতে হইবে—এই ক্ষেত তোমার, এই ক্ষেত আমার, এই ক্ষেত রামের, এই ক্ষেত শ্যামের। এইরূপে আবার কিছুদিন চলিল।

একজন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল:—আমার ত এই ক্ষেত, এই ধান। যদি কম জন্মায়, কি করিয়া চলিবে? সে মনে মনে ঠাহরাইল,

দিক্ আর না দিক্, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলি সঞ্চয় করিয়া অপরের ক্ষেতের ধানগুলি উঠাইয়া লইয়া আসিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া বলিল, "তুমি কর কি? পরের ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিতেছ?" "আর এরূপ করিব না।" কিন্তু আবার সে পরের ধান না বলিয়া তুলিয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া আবার বলিল, "তুমি ফের এই কাজ করিলে?" সে বলিল, "আর এরূপ হইবে না।" কিন্তু কিছুদিন পরে সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এবার আর চুপ করিয়া রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়া দিল। তখন ধানচোর হাত তুলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল,—"দেখ ভাই, আমাকে মারিতেছে, দেখ ভাই আমাকে মারিতেছে,' কি অন্যায়! কি অন্যায়!" এইরূপে পৃথিবীতে চুরি, মিথ্যাকথা ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব হইল।

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল:—আইস, আমরা একজন বলবান, বুদ্ধিমান, সকলের মন যোগাইয়া চলে,—এমন লোককে আমাদের ক্ষেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলে ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভাল লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাহাকে তাহারা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে রাজী হইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল, এই জন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত। এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে পড়িয়া মাটীতে মাটী হইয়া গেল। শেষে তাহাদের ক্ষেত আগলাইবার জন্য একজন ক্ষেতওয়ালার দরকার হইল। সেই ক্ষেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিনা।

মহাবস্তু অবদানে বুদ্ধদেবের জন্মকথা উপলক্ষে এই বৃত্তান্তটি দেওয়া হইয়াছে। এই মহাসম্মতের অনেক পুরুষ পরে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর অনেক পুরুষ পরে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব। সুতরাং মহাবস্তুর বর্ণনাটি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়।

পালি ত্রিপিটকেও এইরূপ একটি গল্প আছে, 'অগ্‌গিঞ্‌ঞ সুত্ত', অর্থাৎ অগ্রণ্যসূত্র, অর্থাৎ কে সকলের আগে—গল্পচ্ছলে তাহার উপদেশ। থেরাবাদীরা এ গল্পটি স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের এক শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ,—তিনি যদিও ভিক্ষু হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব করিতেন। তাই বুদ্ধদেব একদিন তাঁহাকে এই গল্পটি শুনাইয়া দেন। তিনি বলিয়া দেন, ব্রাহ্মণ অগ্রণ্য নয়, ভিক্ষুই অগ্রণ্য।

যে কেহ মহাবস্তুর অবদানের 'রাজবংশে আদি' অধ্যায়টি ও অগ্রণ্য সূত্রটি মন দিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারই মনে হইবে, মহাবস্তু দেখিয়াই এই সূত্রটি তৈয়ারী হইয়াছে। রাজবংশের কথা বলিতে গেলে রাজা কেমন করিয়া হইলেন, সেটা জানিবার ইচ্ছা আপনিই হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে রাজা যে সকলের সম্মতি অনুসারে ক্ষেত আগ্‌লাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, সে কথাটি বলা আবশ্যক। ক্ষেত ত ক্ষেতই আছে, তাহার আবার আগলান কি? সুতরাং ক্ষেত আগ্‌লাইবার কারণও বলার দরকার হয়। কেন ক্ষেত আগলাইবার দরকার হয়, বলিতে গেলে বলিতে হয়, লোকের দোষে। সে দোষ কি? কেমন করিয়া হইল, তাহাও বলিবার প্রয়োজন হয়। মহাবস্তুতে এগুলি সব পর-পর বলা আছে। উহাতে বাজে কথা নাই। কিন্তু পালিসূত্রে অনেকগুলি বাজে কথা আছে। স্ত্রীপুরুষে মার খাইয়া বনে পলাইয়া গেল, ক্রমে বনে তাহাদের বাস হইল, বনে গ্রাম নগর পত্তন হইল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সকল কথা এ উপলক্ষে বলার কোন দরকারই দেখি নাই। তাই বলিতেছিলাম, মহাবস্তু দেখিয়াই সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আরও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারিবর্ণের কথা, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ বড় কি না, এ-সকল কথার মীমাংসা কি এ গল্পের দ্বারা হইতে পারে, এ যেন গণেশের মাথায় গজমুণ্ড দেওয়া। ভাষা দেখিলেই বোধ হয়, মহাবস্তু আগে ও সূত্রটি পরে।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত চলিতেছে। রাজা যে ঈশ্বরের অংশ—এই

মতটি অধিক দেশে চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর, এ কথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। এখনকার দিনে ত অবস্থাটি ঠিক উল্টাইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেকদিন চলিয়াছিল। চন্দ্রকীর্ত্তি খৃঃ পঞ্চমশতকে বলিয়াছেন :—

গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়্ভাগেন ভৃতস্য কঃ।

'তুমি ত দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর কর কি ?'